সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী

দেশে দেশে তাঁর বীণা বাজে—
বাজে কালে কালে ঝঙ্কার ।

সুতপা প্রকাশনী
কলিকাতা-২৩

SAYE VISWAVARANYA SANN

A Biography of

Swami Vivekananda.

By : Moni Bagchee.

শ্রীসুধীরকুমার চক্রবর্তী

ও

শ্রীনমিতা চক্রবর্তী

করকমলেষু।

মানবের মাঝে 'নরেন্দ্র' তুমি,
তুমি হে রাজাধিরাজ।
নরদেহ ধরি মহাদেব তুমি
যোগিবর মহারাজ॥
অনাথ আতুরে বুকে টেনে নিয়ে
বলেছ সেবাই ধর্ম।
ভীতজনে তুমি দিয়েছ অভয়,
মূঢ়জনে জ্ঞানবর্ম॥
বলহীনে তুমি করিয়াছ ঘৃণা,
গেয়েছ সতীর জয়।
শিবজ্ঞানে জীবে সেবা কর সবে
ভগবান লাভ হয়॥
সন্ন্যাসী তুমি শ্রেষ্ঠ আসন
লভেছ ভারত-হৃদে।
শত বরষের জন্ম দিনেতে
নত মাথা তব পদে॥

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত।

নৌমি গুরু বিবেকানন্দম্।

আহিতাগ্নিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আত্মাহুতি ব্যর্থ হয়নি। সেই মহাতাপসের হাড় এখনো বজ্রের মতোন বেজে ওঠে। তাঁর হাতে যেমন ছিল শঙ্খ-পদ্ম, তেমনি ছিল ঝড়-বিদ্যুৎ। রণবিপ্লব তিনি যেমন এনেছিলেন, তেমনি এনেছিলেন শান্তির কুসুমদাম। স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব যেন বাংলার আকাশে পূর্বতোরণে নব সূর্যোদয়। তাঁরই জীবনের আলোকে রাঙিয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষ, এশিয়া, সমস্ত পৃথিবী। সব্যসাচীর মতোই মহিমময় সে অভ্যুদয়। তাঁরই কোদণ্ডের উল্লাসে প্রাচ্যদেশ নেচে উঠেছিল —আর সেই কোদণ্ডের টঙ্কারে দিকে দিকে রণিত হয়েছিল ভারতের জয়ধ্বনি। মাভৈঃ মন্ত্রের ডঙ্কা বাজিয়ে শঙ্কা হরণ করেছিলেন তিনি তাঁর স্বজাতির। ধূর্জটির হাতের পিনাকের মতোন তাঁর কণ্ঠের সেই বলিষ্ঠ ভাষা সেদিন আমাদের প্রাণে এনে দিয়েছিল আশা, উৎসাহ আর বিশ্বাস।

সেই বিশ্ব-মঠ-বিহারী, যজ্ঞাহুতির হোমশিখার মতোন তেজস্বী তাপস— বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে প্রণাম।

মণি বাগচি

৯০, বাগুইআটি রোড,
দমদম, কলিকাতা-২৮

॥ মণি বাগচির অন্যান্য বই ॥

ছোটদের ছত্রপতি

ছোটদের বার্ণার্ড শ

ছোটদের শ্রীঅরবিন্দ

ছোটদের বিবেকানন্দ

ছোটদের গৌতম বুদ্ধ

কাজলরেখা

লীলা-কঙ্ক

আমাদের বিদ্যাসাগর

নানা সাহেব

সিপাহী বিদ্রোহ

কেমন করে স্বাধীন হলাম

বাংলা সাহিত্যের পরিচয়

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ

রবির আলো

অমর-জীবন

মহাচীনে শ্রীনেহরু

গৌতম বুদ্ধ

বিজয়কৃষ্ণ

রামমোহন

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

বিদ্যাসাগর

মাইকেল

কেশবচন্দ্র

রমেশচন্দ্র

বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

নিবেদিতা

নিবেদিতা নৈবেদ্য

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস

সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র

শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটা

Sister Nivedita

Our Buddha

॥ পরবর্তী বই ॥

বাংলার বাঘ আশুতোষ

সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক

(রামকৃষ্ণদেবের জীবনী)

মহাকালের ঘণ্টা বাজলো।

যবনিকা নামলো একটি শতাব্দীর ওপর—বাংলায় উনিশ শতকের অন্তিম প্রহর বিঘোষিত হোল। মহাকালের করধৃত অক্ষমালায় সরে গেল একটি শতাব্দী—সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল আর একটি নূতন শতাব্দী— বিংশ শতাব্দী। উনিশ শতক শেষ হোয়ে আরম্ভ হোল বিংশ শতক। সেই নূতন শতাব্দীকে স্পর্শ করে, ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন এক বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী—যাঁর উদাত্ত কণ্ঠে আমরা সেদিন শুনেছিলাম জাগরণের অগ্নিক্ষরা মন্ত্র—"এসো, মানুষ হও।"

তিনি বললেন: "ওঠো, জাগো। পরিপূর্ণতা লাভ করো।"

একটি পরাধীন ঘুমন্ত জাতিকে এর চেয়ে বড়ো জাগরণের মন্ত্র আর কেউ শোনাতে পারেনি। জাগরণের এই যে সুদীপ্ত মন্ত্র, এই যে বজ্রবাণী, সন্ন্যাসীর উদাত্ত কণ্ঠের এই যে আকুল-করা আহ্বান—এই দিয়েই সেদিন অভিষেক হয়েছিল সেই নূতন শতাব্দীর।

কে এই সন্ন্যাসী?

ইনিই 'স্বামী বিবেকানন্দ'।

এই নামেই ইনি আজ ভুবনবিখ্যাত।

এঁরই জীবনের পুণ্য কাহিনী আজ বলব।

শিমুলিয়ার দত্ত-বাড়ি।

উনিশ শতকের কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ি, সিংহী-বাড়ি, কলুটোলার সেনেদের বাড়ি, রামবাগানের দত্ত-বাড়ি, শোভা-বাজারের দেবেদের বাড়ি, প্রভৃতি অনেক নাম-করা বংশ ছিল। গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটে তেমনি বিখ্যাত ছিল দত্তদের বাড়ি। বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন এই বংশের একজন কৃতী সন্তান। প্রতিভাধর পুরুষ, আইনের ব্যবসায় করতেন। তখনকার দিনে এ্যাটর্ণি বিশ্বনাথ দত্তের খুব প্রতিপত্তি ছিল। যেমন ছিল তাঁর রোজগার, তেমন দান-ধ্যান। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, দাস-দাসী, গাড়ি-ঘোড়া—এইসব নিয়ে রীতিমতো জাঁকজমকের সঙ্গে বাস করতেন বিশ্বনাথ দত্ত। ঐশ্বর্য ও খ্যাতির তুলনা ছিল না তাঁর। প্রতিপত্তিও ছিল কম নয়। পার্থিব সুখের কোনো অভাবই ছিল না তাঁর। এই যেমন, আবার অন্যদিকে তেমনি ছিল প্রবল পাঠানুরাগ আর সঙ্গীতে অনুরাগ। দেশ-বিদেশের অনেক নাম-করা ওস্তাদ তাঁর বাড়িতে এসে গানের মজলিশ বসাতেন মাঝে মাঝে।

দত্ত-গৃহিনী ভুবনেশ্বরী দেবী। যেমন তাঁর রূপ, তেমনি তাঁর গুণ। সামান্য বাংলা লেখাপড়া তিনি জানতেন, কিন্তু নিজের ছিল স্বাভাবিক বুদ্ধি আর জ্ঞানস্পৃহা। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ তিনি রোজ পড়তেন। তাঁর চরিত্রে ছিল আভিজাত্যের একটা সহজ গৌরব অথচ গর্বের লেশমাত্র ছিল না তাঁর স্বভাবের মধ্যে। প্রতিবেশিনীরা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন তিনি; প্রতিদিন নিজের হাতে তিনি শিবের পূজা করতেন।

এই বিশ্বনাথ দত্ত আর ভুবনেশ্বরী দেবী নরেন্দ্রনাথের পিতা-মাতা। স্বামী বিবেকানন্দের আগের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ।

পিতামাতার তিনি ষষ্ঠ সন্তান।

ভাই-বোন মিলে তাঁরা ছিলেন দশজন। এঁদের প্রথম সন্তানটি ছিল পুত্র—এক বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় সন্তান কন্যা—সেটিও এক বছর বয়সে মারা যায়। তৃতীয়া কন্যা, নাম—হরমণি; বাইশ বছর বয়সে এর মৃত্যু হয়; চতুর্থ সন্তানটিও কন্যা—নাম স্বর্ণময়ী, ইনি বাহাত্তর বছর বয়সে মারা যান; পঞ্চম সন্তানটিও কন্যা, শৈশবেই এর মৃত্যু হয়। একটি পুত্র-সন্তানের অভাব তাই ভুবনেশ্বরীর মাতৃহৃদয়কে প্রতিনিয়ত ক্ষুব্ধ করত; ছেলের মুখ দেখতে পেলেন না বলে তাঁর দুঃখের যেন শেষ ছিল না। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় গৃহদেবতা বীরেশ্বরের চরণে প্রণাম করে তিনি একটি পুত্র-সন্তান প্রার্থনা করতেন। সর্বত্যাগী শঙ্কর মায়ের সেই আকুল প্রার্থনা শুনতে পেলেন। একদিন গভীর রাত্রে ভুবনেশ্বরী স্বপ্নে দেখতে পেলেন, তুষারধবল রজতকান্তি মহাদেব যেন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। কাঁটা দিয়ে উঠল তাঁর সমস্ত শরীর। স্বপ্ন কি সত্যি হবে?—মনে মনে ভাবলেন তিনি।

সেই স্বপ্ন—সেই সুখ-স্বপ্ন অবশেষে সত্যে পরিণত হোল।

একদিন পুণ্যলগ্নে ভুবনেশ্বরী দেবীর কোল আলো করে, দত্ত-বাড়িতে আনন্দের বান ছুটিয়ে, জন্ম গ্রহণ করলেন তাঁর ষষ্ঠ সন্তান—নরেন্দ্রনাথ। সেদিন তারিখ ছিল ১২ই জানুয়ারি, ১৮৬৩ সাল। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন। সবেমাত্র প্রভাতের সোনার আলো পৃথিবীর বুকে ফুটে উঠেছে। সেই শুভক্ষণে জন্ম নিলেন ক্ষণজন্মা নরেন্দ্রনাথ। আনন্দের কলধ্বনিতে মুখরিত হোয়ে উঠল দত্ত-বাড়ি বেজে উঠল মঙ্গল-শঙ্খ। আবির্ভাব হোল এক মহামানবের।

দত্ত-বাড়ির কথা এখন থাক।

এইবার একটু ইতিহাসের কথা বলি। এই ইতিহাসটুকু না জানলে নরেন্দ্রনাথ তথা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের তাৎপর্য বা,

মর্মকথা আমরা ঠিকমত বুঝতে পারব না। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন উনিশ শতকের অর্ধেক শেষ হয়ে আরো বারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। বাংলার নবযুগের যুগসারথিরা এই সময়ের মধ্যে একে একে ইতিহাসের জঠর থেকে আবির্ভূত হয়ে নবযুগের গঠনকার্যে নিযুক্ত হয়েছেন। তখন সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতবর্ষের নূতন রাজধানী কলকাতা। ইংরেজ রাজত্বও কায়েম হয়েছে এই দেশে। একটা যুগের অবসানে আরম্ভ হয়েছে আরেকটা নূতন যুগ। বাঙালি তখন অনেকটা আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছে—হিন্দুজাতি ভুলে গেছে তাদের প্রাচীন গৌরবের কথা। খৃষ্টান পাদ্রীরা এসে প্রচার করছে যীশুর বাণী আর শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে করে চলেছে তাদের ধর্মপ্রচার। উনিশ শতকের সূচনায় স্থাপিত হোল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। এলেন এইদেশে মহামতি ডেভিড হেয়ার—নব্যবাংলার ইনিই প্রথম দীক্ষাগুরু। ক্রমে পাদ্রীদের প্রচারকার্য জোর হোতে থাকে—তারা ছড়িয়ে দেয় এই দেশে ধর্মবিদ্বেষ—হিন্দুর আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি সবই কুসংস্কারে ভরা—এইভাবে তারা আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্মের ওপর। কেউ এর প্রতিবাদ করে না, করতে সাহস পায় না। হিন্দুসমাজেও তখন শুরু হয়েছে ভাঙন—শহর কলকাতার বাবুরা মত্ত থাকতেন নানারকম আমোদ-প্রমোদের মধ্যে। সমস্ত দেশ যেন ঘুমিয়ে আছে—সমস্ত জাতি যেন অসাড়। সেইসময়ে কলকাতা শহরে আবির্ভূত হোলেন এক মহাপুরুষ।

ইনি রাজা রামমোহন রায়।

এই রাজা রামমোহন রায় থেকেই আমাদের দেশে নবযুগের আরম্ভ। নবযুগের প্রথম প্রবর্তক তিনিই। তিনি বহু ভাষা জানতেন এবং পৃথিবীতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনা করেন। তাঁর আগে আর কোন দেশে কোন পণ্ডিত ঠিক এই ধরণের

আলোচনায় প্রবৃত্ত হননি। এই রামমোহন ১৮১৬ সালে কলকাতায় এসে 'আত্মীয় সভা' নামে একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন এবং অনুরাগীদের নিয়ে উপনিষদের ধর্ম প্রচার করতে থাকেন ; সঙ্গে সঙ্গে তিনি মূর্তিপূজা ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধেও প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করলেন। হিন্দুধর্মের প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যেমন, খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রচারিত মতবাদের বিরুদ্ধেও তিনি তেমনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এইভাবেই উনিশ শতকের প্রথমভাগে এই অসীম শক্তিশালী পুরুষের চিন্তা ও চরিত্র হিন্দুসমাজের অচলায়তনকে আঘাত করে জাগিয়ে তুললো এক নূতন জীবনের স্পন্দন। ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে ও শিক্ষায়—সকল ক্ষেত্রেই তিনি নিয়ে এলেন একটা বিপ্লব, একটা সংস্কার। হীনতার ও জড়তার পঙ্কশয্যা থেকে তিনি তাঁর স্বজাতিকে টেনে তুলবার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। এইভাবে এই নবযুগপ্রবর্তক দেশহিতকর অনেক কাজ করেছিলেন।

রামমোহনের পর একে একে এলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; এলেন অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ, দীনবন্ধু মিত্র ; এলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু আর রমেশচন্দ্র দত্ত ; এলেন বাংলার নবযুগের সাধনা ও সিদ্ধির মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

সংস্কারযুগের এইসব বরণীয় মহাপুরুষদের সাধনার পরিণত ফল স্বামী বিবেকানন্দ।

উনিশ শতকের শেষভাগে, যখন আমরা সংস্কারের আবর্তে পড়ে কোন পথে যাব তা বুঝে উঠতে পারিনি, পাশ্চাত্যের প্রখর বিদ্যুতের আলোয় যখন আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল, সমস্ত জাতির যখন দিগ্‌ভ্রম হবার উপক্রম—জাতির সামনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন,

সন্দেহের পর সন্দেহ যখন ক্রমেই জমে উঠছিল—আমরা যখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একরকম হতাশ হয়ে উঠেছিলাম—তখন "সেই সংস্কারের ঝড়ে আলোড়িত ও মথিত বাঙালি সমাজের জঠর হইতে আবির্ভূত হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ।"

নরেন্দ্রনাথের পর ভুবনেশ্বরী দেবীর আরো চারটি ছেলে-মেয়ে হয়েছিল; তাঁর সপ্তম সন্তান কিরণবালা; ষোল বছর বয়সে এর মৃত্যু হয়; অষ্টম সন্তানটিও কন্যা, যোগেন্দ্রবালা; বাইশ বছর বয়সে এঁর মৃত্যু হয়। নবম ও দশম সন্তান যথাক্রমে মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ। সর্বকনিষ্ঠ ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার বিপ্লবী যুগের একজন বিশিষ্ট নেতা। মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ দুজনেই তাঁদের অগ্রজ সম্পর্কে ইংরেজি ও বাংলায় জীবনচরিত রচনা করে গেছেন।

কতকাল পরে ছেলের মুখ দেখলেন ভুবনেশ্বরী দেবী।

ঘটা করে তিনি তাই ছেলের অন্নপ্রাশন করলেন। বিশ্বনাথ দত্ত দরাজ হাতে খরচ করলেন এই উৎসবে। স্বপ্নের কথা স্মরণ করে পুত্রের নাম রাখা হয়েছিল বীরেশ্বর ; এখন অন্নপ্রাশনের সময় নূতন করে নাম রাখা হোল—নরেন্দ্রনাথ। উত্তরকালে শিশু এই নামেই পরিচিত হয়েছিলেন।

দেখতে দেখতে নরেন্দ্রনাথ বড়ো হয়ে উঠলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন চঞ্চল, অশান্ত আর স্বেচ্ছাচারী। কারো কথা শুনবেন না, কারো নিষেধ মানবেন না। প্রতিবেশিরা পর্যন্ত উত্যক্ত হোয়ে উঠল তাঁর দৌরাত্ম্যে। একমাত্র ছেলে, বিশ্বনাথ তাই বেশী কিছু বলেন না। কিন্তু ভুবনেশ্বরী একটা আশ্চর্য উপায় উদ্ভাবন করলেন অবাধ্য ছেলেকে বশে আনবার জন্য। 'শিব' 'শিব' বলে নরেনের মাথায় কিছু জল ঢেলে দিলেই সে শান্ত হয়ে যেত। নরেনের ডাকনাম ছিল 'বিলে'। একদিন তার দুষ্টুমিতে অস্থির হয়ে ভুবনেশ্বরী বললেন—"শিব নিজে না এসে একটা ভূত পাঠিয়েছেন। দ্যাখ বিলে, তুই যদি অমন ধারা দুষ্টুমি করিস, সবাইকে উত্যক্ত করিস, তবে মহাদেব তোকে কৈলাসে ঢুকতে দেবেন না কখনো।"

মায়ের মুখে এমনি ধারা কথা শুনে বালক শান্ত হোত। আয়ত চোখ দুটি মেলে সে তাকিয়ে থাকত মায়ের দিকে। মা হাসতেন। আর মনে মনে ভাবতেন, শিবের অংশে নরেনের জন্ম ; এ ছেলে একদিন নিশ্চয়ই বংশের ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি করবে। আরো ভাবতেন—এখন ছোট আছে, একটু বড়ো হোলেই দুষ্টুমি আর থাকবে না। মায়ের এই দুটো আশাই পূর্ণ হয়েছিল।

কতদিন ছেলেকে কাছে বসিয়ে ভুবনেশ্বরী মুখে মুখে রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শোনাতেন। বালক নরেন্দ্র মুগ্ধ হয়ে শুনত সেসব চিত্তাকর্ষক পৌরাণিক কাহিনী। তখন আর সে দুর্দান্ত নরেন্দ্র নয়—শান্ত-শিষ্ট ছেলে। প্রথম প্রথম সীতারামের আদর্শ বালকের মনের অনেকখানি জুড়ে ছিল। সীতারামের পূজাও করতেন বালক বীরেশ্বর। বাজার থেকে তিনি সীতারামের একটা সুন্দর যুগল-মূর্তি কিনে এনেছিলেন ও খেলার সঙ্গীদের নিয়ে সেটা পূজা করতেন। কখনো কখনো মূর্তির সামনে চুপ করে স্তব্ধ হোয়ে বসে থাকতেন। মনে হয় যেন বালক ধ্যানে বসেছেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল ছাদের সেই নির্জন কক্ষে সীতারামের মূর্তি নেই—তার বদলে সেখানে শোভা পাচ্ছে রজত-ধবল সুন্দর একটি শিবের মূর্তি আর সেই মূর্তির সামনে শান্ত হয়ে বসে আছেন বালক নরেন্দ্র। মায়ের অনুকরণে তিনি প্রত্যহ শিবপূজা করতেন ; খেলার সঙ্গিদের ডেকে এনে সবাই মিলে শিবমূর্তিটিকে ঘিরে ধ্যান করতে বসতেন। ছেলেবেলায় শিবপূজা ছিল তাঁর একটি প্রিয় খেলা।

দেখতে দেখতে নরেন্দ্রনাথ কৈশোরে পদার্পণ করলেন।

এইবার বিশ্বনাথ পুত্রের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত হলেন। তখন নরেন্দ্রনাথের বয়স পাঁচ বছর যখন বাড়ির গুরুমশাইয়ের কাছে তাঁর লেখাপড়া আরম্ভ হয়। দুরন্ত ছাত্রটিকে নিয়ে গুরুমশাই যারপর

নাই বিব্রত বোধ করেন। মারধোর করে কোনো ফল হোল না—তাতে বরং উল্টো ফল হোত, ছাত্র বেঁকে বসত। তখন গুরুমশাই মিষ্টি কথায় তাকে বশে আনবার চেষ্টা করেন। এইভাবে শৈশবের পাঠ শেষ হোলে পরে নরেন্দ্রকে মেট্রোপোলিটান স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হোল। এই বে-সরকারী স্কুলটি স্থাপন করেছিলেন বিদ্যাসাগর। স্কুলে এসে সমান বয়সের সহপাঠিদের সঙ্গলাভ করে বালকের আনন্দের সীমা নেই। তাদের নিয়ে তিনি একটা ছোট দল গড়ে তুললেন নিজে হোলেন তার নেতা। কিন্তু স্কুলে এসে নরেন্দ্রনাথের আর একটা বিপদ হোল; পদে পদে বিধি-নিষেধের বাধা এখানে। ছেলেবেলা থেকেই তিনি চঞ্চল প্রকৃতির, এক জায়গায় সুস্থির হয়ে বেশিক্ষণ বসে থাকা তাঁর স্বভাবের মধ্যে ছিল না। স্কুলে ক্লাসের বেঞ্চিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থির হোয়ে বসে থাকা বালকের পক্ষে এক রকম দুঃসাধ্য হোয়ে উঠল। কখনো দাঁড়াতেন, কখনো বসতেন, আবার কখনো বা ক্লাস থেকে বিনা কারণেই ছুটে বেরিয়ে যেতেন। চার দেয়ালের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে তিনি কিছুতেই পারতেন না। শিক্ষকগণ বিব্রত বোধ করলেন এমন অস্থিরচিত্ত ছাত্রটিকে নিয়ে; শাসন করতে গিয়ে দেখলেন সে তেজী ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে থাকে, শাসন মানতে চাইত না। তখন তাঁরা অন্য পথে সেই দুরন্ত ও দুর্বিনীত ছাত্রটিকে বশ করতে উদ্যত হোলেন। মিষ্টি কথা বলে, গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে সংযত করলেন তাঁরা। তবে একটা জিনিস তাঁরা লক্ষ্য করলেন ছেলেটির মধ্যে; অশান্ত প্রকৃতির হোলেও, আর সব ছাত্র অপেক্ষা তার চরিত্রে অনেক স্বাতন্ত্র্য ছিল। ছেলেবেলায় নরেন্দ্রনাথের মধ্যে অনেক মহত্ত্ব দেখা গিয়েছিল, তারই একটা গল্প বলি।

চড়কের মেলা বসেছে কলকাতার ময়দানে।

সঙ্গিদের নিয়ে নরেন্দ্রনাথ গেলেন সেই মেলা দেখতে। তখন

তাঁর বয়স ছয় কি সাত। মাটির তৈরী মহাদেবের কয়েকটা মূর্তি *কিনে তাঁরা ফিরে আসছেন।* হঠাৎ দেখা গেল দলের একটি ছেলে ভীড়ের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আসলে ছেলেটি ফুটপাত থেকে রাস্তায় গিয়ে পড়েছিল আর ঠিক সেই সময়ে সামনে একখানা গাড়ি দেখে সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গিরা ততক্ষণ বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে চলে এসেছে। একটা সোরগোল উঠল—"গেলো, গেলো—ছেলেটা গাড়ি চাপা পড়ল"। চকিতে নরেন্দ্রনাথ থেমে দাঁড়ালেন, পেছন ফিরে তাকালেন। ক্ষণমাত্র দেরী না করে, অসমসাহসী নরেন্দ্র মহাদেবের মূর্তিটা বগলদাবা করে ছুটে এলেন সেইদিকে। ছেলেটি তখন প্রায় ঘোড়ার পায়ের তলায় যায় আর কি। চারদিকে জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, কিন্তু কেউই সাহস করে এগিয়ে গিয়ে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে না। ত্রস্তপদে ভীড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়ালেন নরেন্দ্রনাথ, বাঁ হাতের বগলের মধ্যে শিবমূর্তি ; ডান হাত দিয়ে তিনি ছেলেটিকে টেনে বের করলেন। আর কয়েক সেকেণ্ড দেরী হোলে তার মৃত্যু অনিবার্য ছিল। ছোট একটি ছেলের এমন অসমসাহসিক কাজ দেখে উপস্থিত সকলেই 'ধন্য' 'ধন্য' করে উঠলো। বাড়িতে এসে মায়ের কাছে যখন ঘটনাটা বললেন নরেন্দ্র, তখন ভুবনেশ্বরী ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন : "সব সময়ে এই রকম মানুষের মতো কাজ করিস, বিলে।"

ছেলেবেলায় জুজুর ভয়ে কত ছেলেই না আড়ষ্ট থাকে। ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে তাদের স্বভাবটা হয়ে পড়ে ভীরু। বালক বীরেশ্বর কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই ভয় কাকে বলে তা জানতেন না। তাঁর ছেলেবেলার নির্ভীকতার আর একটা ঘটনা বলি। শিমুলিয়ার দত্ত-বাড়ির পাশেই রায়েদের বাড়ি—গোলক রায়, ধনী ব্যবসায়ী।

রায়েদের বাড়ির একটি ছেলে নরেনের খেলার সাথী। তাদের বাড়িতে একটা চাঁপা ফুলের গাছ ছিল। ঐ গাছের ডালে পা লাগিয়ে, মাথা ও হাত ঝুলিয়ে দোল খেতে নরেনের খুব ভালো লাগত। একদিন বুড়ো রায়-কর্তা তাকে অত উঁচু ডালে দোল খেতে দেখে চমকে উঠলেন। "দত্তদের ছেলের কাণ্ড ছাখো—পড়লে যে হাড়গোড় ভেঙে যাবে।" তা ছাড়া, তাঁর সখের ফুল গাছটা ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু ধমক দিলে সে নিষেধ শুনবে না, রায়-কর্তা তা বিলক্ষণ জানতেন।

—বাবা, বীরু, ঐ গাছটায় উঠতে নেই।

—কেন কাকা? এ গাছটায় উঠলে কি হয়?

—জানো, ও গাছে একটা বেহ্মদত্যি থাকেন—কী তাঁর চেহারা। তোমার মতো আরেকটি ছেলে গাছে চড়ে দোল খেত, বেহ্মদত্যি রেগে তার ঘাড় মটকে দিয়েছিলেন।

নরেন্দ্র সব কথা শুনে চুপ করে রইলেন। রায়-কর্তা চলে গেলেন। ভাবলেন, ও বোধ হয় গাছে আর উঠবে না। কিন্তু তিনি চলে যাবার পর মুহূর্তেই নরেন সগর্বে আবার গাছের ওপর উঠে বসলেন—আগের মতই মনের সুখে নীচের দিকে মাথা করে দোল খেতে লাগলেন। দোল খান আর মনে মনে ভাবেন, ব্রহ্মদৈত্যটাকে একবার দেখতে পেলে হয়। তার খেলার সাথী কিন্তু সত্যি ভয় পেয়েছিল।

—বীরু, বলা যায় না ভাই, অপদেবতা থাকলেও থাকতে পারেন।

—হুঁ, আর ঘাড় মটকালেও মটকাতে পারেন, হেসে বলেন বীরেশ্বর।

—তাই তো।

—তুই একটা আস্ত বোকা। তোর বাবা আমাদের ভয়

দেখাবার জন্যেই এই গল্পটা শুনিয়ে গেলেন। আয়, দোল খাই।

রায়পুর। মধ্যপ্রদেশের একটি শহর।

বিশ্বনাথ দত্ত তখন এখানে বাস করতেন।

নরেন্দ্রনাথের বয়স যখন চৌদ্দ বছর তখন তিনি কঠিন উদরাময় রোগে আক্রান্ত হলেন। বায়ু পরিবর্তনের জন্য পুত্রকে এখানে নিয়ে এলেন বিশ্বনাথ। রায়পুরে তখন স্কুল ছিল না, তাই পিতা স্বয়ং পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। ছেলেকে পড়াতে গিয়ে বিশ্বনাথ দেখলেন তাঁর পুত্র সত্যিই প্রতিভাবান। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া তিনি যত্নের সঙ্গে ছেলেকে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। যে দু'বছর তিনি রায়পুরে ছিলেন সেই সময়ে নরেন্দ্রনাথ তাঁর বাবার কাছে অনেক কিছু শিখেছিলেন। পুঁথিগত বিদ্যা ভিন্ন তিনি ছেলেকে একটি মূল্যবান শিক্ষা এই সময়ে দিয়েছিলেন। সেটি হোল—আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাসের বলেই না বড়ো হোয়ে নরেন্দ্রনাথ খালি হাতে সারা পৃথিবী ঘুরে এসেছিলেন। রায়পুরে এসে তিনি তাঁর পিতার চরিত্রের অনেক মহৎ গুণের পরিচয় পেলেন এবং পুত্রের কিশোর চিত্তে বিশ্বনাথ দত্তের মহত্ত্বের ছাপ স্থায়ীভাবেই এঁকে গিয়েছিল।

কয়েক মাসের মধ্যেই নরেন্দ্র তাঁর স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। দু'বছর বাদে যখন তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন তখন ষোল বছরের নরেন্দ্রনাথের দীর্ঘ, বলিষ্ঠ শরীর দেখে তাঁর বন্ধুরা রীতিমতো বিস্মিত হলেন। সে নরেন আর নেই—এখন তাঁকে দেখতে যেমন বলিষ্ঠ তেমনি প্রিয়দর্শন। এইবার তিনি মেট্রোপলিটানে এনট্রান্স ক্লাসে ভর্তি হলেন এবং এক বছর পরে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সবাইকে অবাক করে দিলেন।

এইবার নরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তি হলেন।

কলকাতার সেরা কলেজ—প্রেসিডেন্সী কলেজ। বিশ্বনাথ ছেলেকে এই কলেজেই ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু প্রথম বছরেই ধরলো তাঁকে ম্যালেরিয়া জ্বরে। জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ে না। বাধ্য হয়ে কলেজ ছাড়তে হোল। পরের বছর আরোগ্য লাভ করে তিনি ভর্তি হলেন জেনারেল এসেম্ব্লীজ ইন্‌ষ্টিটিউসানে। এটা ছিল সাহেবদের কলেজ।

কলেজের প্রিন্সিপাল উইলিয়ম হেষ্টি। যেমন পণ্ডিত, তেমনি কবি ও দার্শনিক। অল্পদিনের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথ কলেজে খুব বিখ্যাত হয়ে পড়লেন তাঁর সহপাঠিদের মধ্যে। অধ্যাপকগণ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এত সহজে তাঁর প্রতিপত্তি হয়েছিল কেন? তাঁর সহপাঠিরা যে কেবলমাত্র তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন তা নয়। তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর সেই ব্যক্তিত্ব-মণ্ডিত লোককান্ত চেহারা দেখে, তাঁর চরিত্রের গুণাবলী দেখে আর তাঁর গান শুনে। নরেন্দ্রনাথের গানের যাদু তাঁর তর্কশক্তির চেয়ে সহপাঠিদের বেশি করে আকর্ষণ করেছিল। "নরেনের গান যে একবার শুনেছে আর তার পদ্মপলাশ চোখ দুটির মর্মভেদী দৃষ্টি যে দেখেছে—সেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে"—এই কথা বলেছেন

তারই এক সহপাঠী দাশরথী সান্যাল। ইনি বড়ো হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের একজন নাম-করা উকিল হয়েছিলেন।

কলেজের সেরা ছাত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত, কিন্তু তাই বলে তিনি 'গ্রন্থকীট' ছিলেন না। মেধাবী ছিলেন, অন্যের পক্ষে যা আয়ত্ত করতে দু'ঘণ্টা লাগত, তাঁর পক্ষে তা আয়ত্ত করতে বিশ মিনিটও লাগত না। স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। পড়াশুনায় যেমন ছিল মনোযোগ, তার চেয়ে বেশি মনোযোগ ছিল শরীর-চর্চায়—ডন, কুস্তী, খেলায় ইত্যাদি তাঁর উৎসাহ আর আগ্রহের সীমা ছিল না। সেই বয়সে তাঁর দৈহিক শক্তি, সুগঠিত শরীরের সুদৃঢ় পেশী সকলের আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লেখাপড়া, শরীরচর্চা সেই সঙ্গে গান-বাজনা, হাসিখুসি হৈচৈ—এইভাবে নরেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের দিনগুলি অতিবাহিত হোত। ক্লাসে যেসব বই পড়ান হোত, তিনি তাঁর বাইবে আরো অনেক বই পড়েছিলেন বি. এ. পরীক্ষার আগেই। সেই বয়সেই তিনি মিল, হিউম ও হার্বার্ট স্পেন্সরের মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

—দত্ত একটি প্রতিভাবান ছাত্র। একদিন ক্লাসে বললেন হেষ্টি সাহেব।

কলেজে নরেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এই দুজনই ছিলেন তাঁর খুব প্রিয় ছাত্র। এঁরা দুজনে প্রিন্সিপালের কাছে দর্শনশাস্ত্র পড়তেন। ব্রজেন্দ্র আর নরেন্দ্র দুজনে অভিন্নহৃদয় বন্ধু। দুজনে মাত্র একবছরের ছোট-বড়ো। দুজনেই বড়ো হয়ে দেশের ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন তাঁর সময়ে ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ ও সর্বজনমান্য জ্ঞানী পুরুষ। তাঁকে ভারতবর্ষের 'সক্রেটিস' বলা হোত—এমনি ছিল তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিধি। কলেজে মাঝে মাঝে বিতর্ক সভা বা ডিবেটিং হোত; তাতে দুজনেই যোগদান করতেন। প্রিন্সিপাল হেষ্টিসাহেব সেই সভায়

সভাপতি হতেন। দর্শনের মতো কঠিন শাস্ত্র নিয়ে একদিন বিতর্ক হয়। সেদিন নরেন্দ্রনাথ একটি বিশেষ দার্শনিক মত সম্পর্কে এমন সুন্দর ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলেন যা শুনে হেষ্টি সাহেব পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বললেন—"দর্শনের দেদীপ্যমান ছাত্র তুমি। এমন ছাত্র আমি জীবনে খুব বেশি দেখিনি।"

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করার একটা ফল এই দাঁড়াল যে, নরেন্দ্রনাথের মনের মধ্যে সংশয় দেখা দিতে আরম্ভ করল। ভগবান বলে কেউ আছেন—এই বোধ বা বিশ্বাস যুবক নরেন্দ্রনাথ ক্রমেই যেন হারিয়ে ফেলতে লাগলেন। ঠিক এই সময় থেকেই তাঁর মধ্যে জেগে উঠল সত্যলাভের জন্য একটা তীব্র ব্যাকুলতা। প্রিয়বন্ধু ব্রজেন্দ্রকে একদিন নরেন তাঁর মনের ভাব অকপটে খুলে বললেন। বললেন, "ভাই ব্রজেন, আমার মনের মধ্যে ঝড় উঠেছে, বড়ো অশান্তি বোধ করছি।"

—দ্যাখো নরেন, ভগবান-টগবান সব কল্পনা।

—কল্পনা! বলিস কি ব্রজেন?

—হ্যাঁরে—ভগবান হিন্দুদের কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়।

—তবে পথ কোথায়?

—পথ? স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির পথই হোল আসল পথ। তুই শেলি পড়েছিস।

—না।

—আয়, তোকে শেলির কবিতা পড়াই।

পড়লেন নরেন্দ্রনাথ শেলির কবিতা। ভালো লাগলো, কিন্তু আলো পেলেন না। তাঁর মন সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকে। জোড়াসাঁকোর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছেন তিনি—আর শুনেছেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কথা। কেশবচন্দ্রের

উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুনতে থাকেন, ভালো লাগে, কিন্তু আলো পান না। তাঁর মন এখন সত্যের আলো খুঁজে বেড়ায়। চুঁচড়োয় গঙ্গার উপরে একখানা মস্ত বড়ো নৌকা। সেই নৌকায় বাস করেন তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তার কাছে এলেন একদিন যুবক নরেন্দ্রনাথ। নৌকার মধ্যে ধ্যানমগ্ন সেই মহাপুরুষকে দেখে খুব পছন্দ হোল। নরেন্দ্রনাথ বসে আছেন। অনেকক্ষণ বাদে মহর্ষির ধ্যান ভাঙল। চোখ চেয়ে তিনি সবিস্ময়ে দেখেন তাঁর সামনে বসে এক যুবক। টানা-টানা দুটি চোখের দৃষ্টিতে তার মনের ভাষা যেন ভেসে উঠেছে—কী যেন একটা ব্যাকুলতায় যুবকের সারা চিত্ত অস্থির।

—তোমার নাম কি? জিজ্ঞাসা করেন মহর্ষি গম্ভীর স্বরে।

—আমার নাম নরেন, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত। শিমুলিয়ার দত্তবাড়ির ছেলে আমি।

—বিশ্বনাথ দত্ত তোমার কে হন?

—বাবা।

—খুব ভালো লোক তিনি। তুমি কি কর?

—কলেজে পড়ি।

—বেশ, বেশ। আমার কাছে কি চাও?

—ভগবানকে দেখতে চাই। লোকে বলে আপনি নাকি ঈশ্বর দর্শন করেছেন। সত্যি?

মহর্ষি নিরুত্তর। এ তো কলেজে পড়া যুবকের কথা নয়, এ যে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল এক আত্মার কথা। কোনো শিক্ষিত যুবক যে সোজাসুজি তাঁকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে, মহর্ষি তা কখনো ধারণাই করতে পারেন নি।

—বলুন, আপনি ভগবানের দর্শন পেয়েছেন?

যুবকের কথায় ব্যাকুলতা। মহর্ষির অন্তরকে তা স্পর্শ করল।

তিনি শুধু বললেন—তোমার ঐ টানা টানা চোখ দু'টি দেখেই আমি বুঝেছি তুমি একজন যোগী।

—যোগী-টোগী আমি নই, মশাই, নরেনের কথায় যেন একটু বিরক্তির ভাব।

—আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তোমার যখন সময় আসবে, তখন তুমি একদিন নিশ্চয়ই ভগবানের সাক্ষাৎ পাবে—এই বলে মহর্ষি নরেনের মাথায় হাত রাখলেন। তিনি শান্ত মনে গৃহে ফিরলেন।

মনের ব্যাকুলতা নিয়ে যুবক নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজে যাওয়া-আসা করতে থাকেন। রামমোহন রায়ের বইগুলো পড়লেন। সমাজে মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দের প্রার্থনা শুনলেন এবং অবশেষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করলেন। যেদিন সমাজে তিনি একখানি গান গাইলেন, সেদিন থেকে সমাজে লোকের ভীড় বাড়তে লাগল। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের সুমধুর গান হোয়ে দাঁড়াল সমাজের একটা বিশেষ আকর্ষণ। ব্রাহ্ম সমাজে তিনি নাম লেখালেন বটে, কিন্তু উপাসনা সম্পর্কে সমাজের অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে তিনি একমত হোতে পারলেন না। অন্যের মত নির্বিচারে কিছু গ্রহণ করা বা মেনে নেওয়া, নরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে তা কোনোদিনই ছিল না। তবে প্রত্যেক রবিবারে উপাসনার সময় তিনি মধুর কণ্ঠে ব্রহ্ম-সঙ্গীত গেয়ে সভ্যদের আনন্দ দিতেন এবং আন্তরিকতার সঙ্গে উপাসনায় যোগদান করতেন। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের শুষ্ক উপাসনায় যুবকের মন তৃপ্তি পেল না, শান্তি পেল না। একটা জ্বলন্ত ধর্মবুদ্ধি তখন জেগেছে তাঁর মনের মধ্যে। তিনি দেখতে চান জীবন্ত সত্যকে।

ঠিক এইসময়ে একদিন ক্লাসে হেস্টি সাহেব ছাত্রদের ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের কবিতা পড়াতে পড়াতে হঠাৎ বললেন—প্রকৃতির সঙ্গে এই রকম আত্মীয়তালাভ এই মনুষ্য-জীবনেই সম্ভব, এর প্রত্যক্ষ

দৃষ্টান্ত যদি তোমাদের মধ্যে কেউ দেখতে চাও, তা'হোলে যাও দক্ষিণেশ্বরে, সেখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখে এসো। তিনি যেন প্রকৃতির সন্তান।

—রামকৃষ্ণ পরমহংস!

নামটা যেন গেঁথে গেল নরেনের মনে।

এর দু'দিন বাদে শিমুলিয়ার সুরেন মিত্তিরের বাড়িতে এসেছেন পরমহংসদেব। সুরেন তাঁর একজন ভক্ত। দত্তদের বাড়ির খুব কাছেই তাঁদের বাড়ি। ঠাকুর গান শুনতে ভালবাসেন। কিন্তু তেমন গায়ক কোথায় পাওয়া যায় এখন। একজন বললে, কেন, আমাদের নরেন তো খুব ভালো গান গায়, তাকে ডাকলেই আসবে। সুরেনবাবু আর বিশ্বনাথবাবু দুই বন্ধু। তাই বন্ধুর কাছ থেকে যখন অনুরোধ এলো, তখনি তিনি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন সেখানে। নরেনের গান শুনে ঠাকুর মুগ্ধ হলেন।

—ছেলেটা কেগা, শুধোলেন সর্বজ্ঞ ঠাকুর।

—দত্তবাড়ির ছেলে। কলেজে পড়ে। ওর বাবা এ্যাটর্ণি, বললেন সুরেনবাবু।

ফিরবার সময়ে ঠাকুর বার বার করে নরেনকে বলে এলেন, একদিন যাস আমার ওখানে, কেমন?

—কোথায়?

—দক্ষিণেশ্বরে।

দেখতে দেখতে এফ. এ. পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকায় দক্ষিণেশ্বরে যাবার কথা নরেন্দ্র একরকম ভুলেই গেলেন। যথাসময়ে পরীক্ষা হোয়ে গেল। ভুবনেশ্বরী এইবার ছেলের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হলেন।

—মা, আমি বিয়ে করব না।

—ও মা, পাগল ছেলে কি বলে দ্যাখো।

—না, মা। আমি সত্যি বলছি বিয়ে করব না। মনে নেই ছেলেবেলায় আমি প্রথমে সীতারামের ভক্ত ছিলাম, তারপর সর্ব-ত্যাগী শিব হলেন আমার উপাস্য।

—ছেলেবেলার কথা এখন কি? এখন তুই বড়ো হয়েছিস্, আমার কত সাধ তোর বিয়ে দিয়ে ঘরে একটা টুকটুকে বৌ আনব; কর্তা তো একটা সম্বন্ধও ঠিক করেছেন; তাঁরা দশ হাজার টাকা যৌতুক দেবেন বলেছেন।

—দশ লাখ পেলেও না।

কথাটা ক্রমে বিশ্বনাথ দত্তের কানে গেল। তিনি স্ত্রীকে বললেন, ওরকম কথা সব ছেলেই বলে থাকে। তুমি কিছু ভেব না। বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হোক—তারপর বিয়েটা দিতে দেরী হবে না।

স্বামী-স্ত্রীতে সেদিন ঐ পর্যন্ত কথা হোল।

রাম দত্ত বিশ্বনাথ দত্তের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। রামবাবু রামকৃষ্ণের গৃহী-ভক্তদের মধ্যে একজন। নরেন তাঁকে 'কাকা' বলে ডাকতেন। এই সময় একদিন তিনি রামদত্তের সঙ্গে দেখা করে বললেন, "কাকা, মনটা বড়ো অশান্ত হয়েছে, কি করি বলুন তো"?

—যদি আমার কথা শুনিস্ তো বলি। ওসব ব্রাহ্ম সমাজ-টমাজ ছেড়ে দে; দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের কাছে চল্, সব ঠিক হয়ে যাবে। যাবি, বল্?

নরেন্দ্র রাজী হলেন, বললেন, যাব।

দক্ষিণেশ্বরে এলেন নরেন্দ্র একদিন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তখন ভক্তদের নিয়ে ধর্মের কথা আলোচনা করছিলেন। ধর্মের কথা, মায়ের কথা ছাড়া অন্য কথা তিনি বড়ো একটা বলতেন না। নরেন্দ্র দেখলেন অতি সাধারণ একটি মানুষ। পরনে সরু কালো পাড়ের ধুতি; সে ধুতি আবার হাঁটু পর্যন্ত; ধুতির একটা দিক কাঁধের ওপর। সামান্য একখানা তক্তপোষের ওপর বসে আছেন। পাশেই পানের একটা বটুয়া, তার থেকে পান বের করে মাঝে মাঝে পান খাচ্ছেন। মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি। দেখলে ভক্তি হয়, কি শ্রদ্ধা জাগে এমন দরের চেহারা নয়, তবু তাঁর মুখখানি যেন কী একটা দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত আর কী ভাবে ভরা তাঁর দুই চোখের দৃষ্টি। নরেনের মনে জাগে বিস্ময়। বিস্ময়ের সঙ্গে কৌতূহল। হাত তুলে প্রণাম করে বসলেন তিনি একপাশে চুপ করে।

নরেনকে দেখামাত্র রামকৃষ্ণের আনন্দ শতধারায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ও যেন তাঁর কতকালের চেনা, এমনধারা ব্যবহার করেন তার সঙ্গে।

—গান গা, শুনি, বলেন রামকৃষ্ণ স্নেহভরে।

নরেন গান গাইলেন।

গান শেষ হোল। এবার তিনি নরেনের খবর জিজ্ঞাসা করেন, তার বাবার খবর, মায়ের খবর—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর তিনি নিলেন। এফ. এ. পাশ করে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছেন, তাও তিনি জেনে নিলেন। তারপর হঠাৎ বলে ওঠেন, "আয় দেখি একবার আমার সঙ্গে।"

এই বলে তিনি নরেনের হাত ধরে তাকে নিয়ে গেলেন পাশের আরেকটা ঘরে। ভক্তরা তো অবাক। সেখানে কেউ নেই—শুধু রামকৃষ্ণ আর নরেন্দ্রনাথ। নরেনের হাত দু'টি ধরে আছেন তিনি ; স্নেহ-বিহ্বল ভাবে বললেন : "তুই এতদিন আসিস্ নি কেন ? কেমন করে ভুলে ছিলি ? তুই আসবি বলে আমি কতদিন ধরে পথের দিকে চেয়ে আছি।"

বলতে বলতে বুকের কাছে টেনে নিলেন নরেনকে তিনি। চোখ দু'টো তাঁর জলে ভরে ওঠে। বলেন—"মনের কথা বলার মানুষ পাইনে ; যারা এখানে আসে, তারা সব বিষয়ী—কেবল সংসারের কথা, টাকা-পয়সার কথা বলে আমার সঙ্গে। ওদের সঙ্গে কথা বলে আমার মুখ তেতো হয়ে গিয়েছে। আজ থেকে তোর সঙ্গে—তোর মতো একজন সত্যিকারের ত্যাগীর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাব।"

রামকৃষ্ণ চুপ করলেন।

নরেনের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নেই।

কে এই অদ্ভুত সন্ন্যাসী ? মনে মনে ভাবেন তিনি। কিন্তু কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

হঠাৎ রামকৃষ্ণ একটা কাণ্ড করে বসলেন। হাত দুটো জোড় করে দাঁড়িয়ে পড়েন আর নরেনকে লক্ষ্য করে বলেন : "তুমি নর-দেহে নারায়ণ—দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্যেই তোমার আগমন। তুমি এসেছ জীবের কল্যাণ কামনায়"—আর বলতে পারেন না।

—সে কি মশাই? বেশতো আজগুবি কথা বলছেন। আমি বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন দত্ত।

—ওরে আমি জানি তুই কে। রামকৃষ্ণ আর কিছু বললেন না। আবার তিনি ভক্তদের মধ্যে ফিরে এসে সহজভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

সেদিন ঐ পর্যন্ত। কলেজের উচ্চ-শিক্ষিত যুবক নরেন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি এই দেব-মানবের চরিত্রের মর্ম বুঝতে গিয়ে বিষম ধাক্কা খেল। আর একদিন এলেন দক্ষিণেশ্বরে। সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন—"মশাই, আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?

—হ্যাঁ দেখেছি।

—কল্পনায় দেখা নয়, সত্যি-সত্যি দেখেছেন কি না?

—সত্যি-সত্যি দেখেছি, এই তোকে যেমন আমার সামনে দেখছি।

—কথা বলেছেন ভগবানের সঙ্গে?

—বলেছি বৈকি। রোজই তো বলি।

এ পাগল পূজারী ব্রাহ্মণ বলে কি! নরেনের মন তাঁর দিকে একটু আকর্ষণ বোধ করলো। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তাঁকে স্বীকার করতে তাঁর বৈজ্ঞানিক বিচার-বুদ্ধিতে বাধল। কেশব সেন, বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি কত বড়ো বড়ো লোক এখানে আসেন, নরেন্দ্র দেখলেন। হয়ত মানুষটা পাগল নয়। যাই হোক, তিনি ঠিক করলেন, ভালো করে বাজিয়ে নিতে হ'বে। রাখাল ঘোষ নামে তাঁর এক পরিচিত বন্ধু ছিলেন। তিনিও ব্রাহ্ম সমাজের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন। ইনি কিছু আগে থেকেই দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া-আসা শুরু করেছেন। নরেন একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললেন, "হ্যাঁরে রাখাল, লোকটাকে তোর কি রকম মনে হয়, সত্যি বলবি?"

—ঈশ্বরপ্রেমিক।

—তাহ'লে ঈশ্বরদর্শী নয় ?

—হ্যাঁ, তাও। তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

—আচ্ছা রাখাল, তুই মূর্তি-পূজায় বিশ্বাস করিস্ ? বিশ্বাস করিস্ যে দক্ষিণেশ্বরে ঐ ভবতারিণী জাগ্রত দেবী ?

—হ্যাঁ করি। আমি তো ঐ প্রতিমাকে প্রণাম করি যখনই ওখানে যাই।

—তুই মিথ্যাচারী, রাখাল। তুই না ব্রাহ্ম সমাজের খাতায় নাম লিখিয়েছিস, তুই না 'একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করব' —এই মর্মে সমাজের প্রতিজ্ঞা-পত্রে সই করেছিস।

একদিন রামকৃষ্ণদেবের সামনেই নরেন্দ্র রাখালকে আবার এই কথা বললেন। রাখাল অপ্রতিভ হয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রামকৃষ্ণ রাখালকে ছেলের মতো ভালবাসতেন। তাই তিনি নরেনকে বললেন—"ওর যদি সাকারে ভক্তি হয়, তাহলে ও কি করবে ? তোমার ভালো না লাগে তুমি করো না।"

সত্যি কথা কি, নিরাকার ধ্যানই নরেনের ভালো লাগত।

আবার একদিন রাম দত্তকে নরেন জিজ্ঞাসা করেন—"কাকা, সত্যি করে বলো তো, তোমার দক্ষিণেশ্বরের ঐ অদ্ভুত মানুষটি কি সত্যিই ভগবানকে দর্শন করেছেন ?"

—হ্যাঁ, রে হ্যাঁ—এই আমি তোর গা-ছুঁয়ে বল্‌ছি।

এইভাবে নরেন আসা-যাওয়া করেন। সংশয় কিছুটা কেটেছে, কিছুটা রয়ে গেছে। অন্তর থেকে কে যেন তাঁকে বলে—তোমার সাধনা ও সিদ্ধি যা কিছু সব দক্ষিণেশ্বরে ঐ মানুষটির পায়ের তলায়। দিন যায়। নরেন কেবলই অনুভব করতে লাগলেন রামকৃষ্ণের প্রেমের আকর্ষণ। গভীর ও নিবিড় সেই প্রেম। একমাস পরে একদিনের কথা। নরেন এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। সেদিন এসে

দেখেন কেউ কোথাও নেই, রামকৃষ্ণ একা তাঁর ছোট বিছানাটির ওপর বসে আছেন। নরেনকে দেখে ভারি খুশি। তাঁকে আদর করে বসালেন নিজের পাশেই। পরক্ষণেই ঘটল একটা আশ্চর্য ব্যাপার। সমাধিস্থ হয়ে গেলেন মহাপুরুষ আর সেই অবস্থায় তিনি ধীরে ধীরে তাঁর দক্ষিণ পদতলখানি রাখলেন নরেনের বুকের ওপর। পলকে প্রলয় ঘটে গেল। সেদিনকার সেই বিচিত্র ঘটনাটার বিষয় বিবেকানন্দ তাঁর নিজের মুখে এইভাবে বলেছেন:

"অমনি আমার ভেতরে একটা অচিন্ত্যনীয় পরিবর্তন ঘটে গেল। দেখতে দেখতে আমার চোখের সামনে থেকে দৃশ্য জগৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘরে দেয়াল নেই, আসবাব-পত্র কিছু নেই—কোনো দৃশ্য পদার্থই দৃষ্টিপথে দেখা যায় না। একটা অসীম শূন্যতা আমার চারদিকে বিরাজ করতে লাগল। নিজেকে হারাবার উপক্রম হোল। আমি ভয়ে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম; বললাম—'ওগো, তুমি আমার এ কী করলে? আমার যে বাপ-মা ভাই-বোন আছে।' ঠাকুর হেসে আমার বুকে হাত রাখলেন; সঙ্গে সঙ্গে আমি ফিরে পেলাম আগের অবস্থা। দৃশ্য জগৎ আবার ধীরে ধীরে চোখের সামনে ফুটে উঠল। এই ঘটনায় আমার মনে এক গভীর সমস্যার উদয় হোল। এই কী সমাধির অনুভূতি, না দক্ষিণেশ্বরের এই পাগলের বশীকরণ বিদ্যা? আমার বিচার-বুদ্ধি দিয়ে কোনো কূল-কিনারা পেলাম না এর।"

তিন বছর পরের কথা।

নরেন্দ্র যথাসময়ে বি. এ. পাশ করলেন।

স্বভাব সেই আগের মতো—ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় যোগদান করেন, ব্রহ্মজ্ঞানী কেশব সেন ও বিজয় গোস্বামীর সঙ্গ করেন, আবার মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পরমহংসকে দর্শন করে আসেন।

একদিন ব্রাহ্ম সমাজের তরুণ নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁকে ডেকে বললেন : "শুনলাম তুমি নাকি দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া আসা কর? শোনো, একটা কথা বলি তোমাকে। ওসব সমাধি, ভাব-টাব যা দেখ ওখানে, ওসব ভূয়ো, স্নায়ু দুর্বল হোলে এইরকম ব্যাপার হয়। আসলে পরমহংসদেবের মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি আর ওখানে যেও না।"

নরেন্দ্র নিরুত্তর রইলেন।

তাঁর অন্তরে ঝড় উঠল।

সংশয় আর অবিশ্বাসে আলোড়িত হয় তাঁর চিত্ত।

সেদিন সারা রাত তাঁর ঘুম হোল না। বিনিদ্র চক্ষে কত কথাই ভাবতে লাগলেন। সকাল হোল। কাউকে কিছু না বলে তিনি চলেন দক্ষিণেশ্বরে। এসে দেখেন ভক্তরা ঘিরে বসে আছেন পরমহংসদেবকে। তাদের সঙ্গে তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা করছেন— আলোচনা করছেন ধর্মের বিষয়। কী সহজ ভাবেই না তিনি এমন কঠিন বিষয়ের আলোচনা করছেন। ঘরের পরিবেশ যেন একটা দিব্য ভাবে পূর্ণ। নরেন্দ্রের মনটা বেশ হাল্কা হোল।

আর একদিনের কথা। মাঝখানে তিনি অনেকদিন যেতে পারেন নি দক্ষিণেশ্বরে। রামকৃষ্ণ খুব ব্যাকুল হলেন তাঁকে দেখবার জন্য। ভাবলেন সমাজে গেলে নরেনকে দেখতে পাবেন। সেদিন রবিবার। ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা আরম্ভ হয়েছে। ঘর-ভর্তি লোক। বেদী থেকে আচার্য বক্তৃতা করছেন। ঈশ্বরীয় আলোচনা শুনে রামকৃষ্ণ ভাবসাগরে ডুবে গেলেন অমনি—সেই অবস্থায় তিনি এগিয়ে এলেন বেদীর কাছে। কলের পুতুলের মতন চলেছেন তিনি—কোনো হুঁস নেই, বাহ্যজ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েছে। মাটিতে পড়ে যান আর কি। সভায় তুমুল চাঞ্চল্য দেখা দিল। ব্রহ্মজ্ঞানীরা ভাব-সমাধি বুঝত না, তাই তারা বিরক্ত হোয়ে ওঠল

রামকৃষ্ণের সেই অবস্থা দেখে। কেউ ভদ্রতা করে তাঁকে সম্ভাষণ পর্যন্ত করল না, শিষ্টাচার দেখানো তো দূরের কথা। নরেন্দ্র এই দৃশ্য দেখে ব্রাহ্মদের ওপর ক্রুদ্ধ হলেন মনে মনে। তিনি রামকৃষ্ণের সমাধি-মগ্ন দেহখানি সযত্নে ধরে তাঁকে বাইরে নিয়ে আসেন। রামকৃষ্ণের প্রতি ব্রাহ্মদের এই ব্যবহারে তিনি গভীর আঘাত পেলেন। সেইদিন থেকে ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়া তিনি ত্যাগ করলেন।

নরেন্দ্রনাথ যে বছর বি. এ. পাশ করেন সেই বছরে তাঁর পিতার মৃত্যু হোল। পিতার মৃত্যুকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন না—বরানগরে গিয়েছিলেন তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে। সেখানেই তিনি এই দুঃসংবাদ পেলেন। বিশ্বনাথের মৃত্যুতে তিনি যেন পৃথিবী অন্ধকার দেখলেন। আইন ব্যবসায়ে যথেষ্ট উপার্জন করলেও, উদার ও দানে মুক্তহস্ত ছিলেন বলে বিশ্বনাথ দত্ত ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় করে যেতে পারেন নি। মাসে হাজার টাকা করে খরচ হোত যে সংসারে, সে সংসার এখন চলবে কি করে? সংসারের কথা যুবক নরেন্দ্র কোনোদিনই চিন্তা করেন নি, আজ তাই হঠাৎ তিনি দারিদ্র্যের কঠিন স্পর্শে যেন চমকে উঠলেন। সম্মুখে কঠিন জীবন-সংগ্রাম। বিধবা মা, এতগুলি ভাই-বোন, এদের মুখের গ্রাসের জন্য জীবন-সংগ্রামে তাকে নামতে হবে, কারণ তিনিই বাড়ির জ্যেষ্ঠ সন্তান। জ্যেষ্ঠ ও কৃতী সন্তান। তাঁর চিন্তা থেকে রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর, ভগবান সব উবে গেল এক মুহূর্তে। এর পর সংসারের গুরুভার দায়িত্ব বহন করবার জন্য নরেন্দ্রনাথ প্রস্তুত হলেন।

জীবন-সংগ্রাম যে কি কঠিন, তা এতদিন প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত-পালিত নরেন্দ্র বুঝতে পারেন নি। এখন বুঝলেন। বি. এ. পাশ করবার পর তিনি একদিকে আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন,

অন্যদিকে কাজকর্মের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কোনো সুবিধাই করে উঠতে পারলেন না। কোথায় তিনি ঠিক করেছিলেন বিলেতে গিয়ে সিবিল সার্বিস পড়বেন, বিশ্বনাথের কত সাধ ছিল ছেলেকে ব্যারিষ্টার করবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক—এই বোধ হয় পৃথিবীর নিয়ম। নরেন্দ্রনাথই কি ভেবেছিলেন যে তাঁকে অত অল্পবয়সে জীবন-সংগ্রামে নামতে হবে।

কি কঠিন এই জীবন-সংগ্রাম।

আর কি মর্মন্তুদ এই ভাগ্যের পরিহাস।

যে বিশ্বনাথ দত্তের দানে ও বদান্যতায় কত লোক উপকৃত হয়েছে, প্রতিপালিত হয়েছে কত আত্মীয়-স্বজন, আজ তাঁরই ছেলেকে কি না দাঁড়াতে হোল অন্যের কাছে হাত পেতে। মুখে সহানুভূতি জানালো অনেকেই, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ এমন একজনকে পেলেন না যার ওপর তিনি ভরসা করতে পারেন এই দুর্দিনে। বিপদ কখনো একা আসে না। নরেন্দ্রনাথের জীবনেও তার ব্যতিক্রম হোলো না। তিনি যখন জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যস্ত, তখন আর একটা বিপদ দেখা দিল। তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেরই হিংসা ছিল বিশ্বনাথ দত্তের ঐশ্বর্যের ওপর। যেই তিনি মারা গেলেন, অমনি তাঁর ছেলে-মেয়েদের বাস্তুচ্যুত করবার জন্য একজন আত্মীয় এক মামলা করলেন। বিষম বিপদে পড়লেন নরেন্দ্রনাথ। মোকদ্দমা লড়তে গেলে টাকার দরকার, সে টাকা তাঁর কোথায়? বাবার এক বন্ধু মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের এ্যাটর্ণি নিমাই বসু—তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন তিনি। বললেন "কাকা, দেখুন তো কি বিপদ।"

নিমাই বসু সব কথা শুনে বললেন—"হুঁ, ভারি বিপদ তো দেখ্‌ছি। তবে আমি বেঁচে থাকতে তোমার গায়ে যে কেউ আঁচড় দেবে, এ হবে না। বিশ্বনাথ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, তুমি আমারই ছেলের মতন, বাবা। ভয় কি? বাড়ির দলিলখানা

একবার পাঠিয়ে দিও আমার কাছে।" নরেন্দ্র আশ্বস্ত হলেন। নিমাইবাবুর চেষ্টায় তিনি এই মামলার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। বিশ্বনাথ বেঁচে থাকতেই তিনি এই নিমাইবাবুর কাছে কিছুদিন এ্যাটর্ণির ব্যবসায় শিখেছিলেন।

দিন যায়। সংসারের কঠিন মূর্তির সঙ্গে নরেনের পরিচয় আরো নিবিড় হয়। ভাগ্যচক্রের তাড়নায় ঐ অবস্থায় পড়লে অন্য যে কেউ হোলে স্থির থাকতে পারত না; কিন্তু এই যুবকের চরিত্র অন্য উপাদানে তৈরী ছিল। দেখতে দেখতে পিতার মৃত্যুর পর কয়েক-মাস কেটে গেল। চাকরির কোনো সুবিধা কোথাও হোল না। গৃহে অন্নাভাব তীব্র হয়ে ওঠে। কোনো কোনো দিন পরিবারবর্গের খাবার জন্য কিছু জোটে না। বাইরে কতদিন ক্ষুধার তাড়নায় নরেন্দ্র রাস্তার কল থেকে অঞ্জলিভরে জল পান করে ক্ষুধা নিবারণ করতেন। উপবাসে তাঁর সেই বলিষ্ঠ শরীর শীর্ণ হয়ে যায়। যদি কেউ সাহায্য করতে আসত, তিনি তা গ্রহণ করতেন না। এমনি প্রখর ছিল তাঁর আত্ম-মর্যাদাবোধ। ক্ষুধার জ্বালায় কারো কাছে তিনি হাত পেতে সাহায্য নেবেন—এমন চিন্তাও তাঁর কাছে অসহ্য।

আমাদের দিন কি এই ভাবে যাবে? ভগবান কি আমাদের প্রতি মুখ তুলে চাইবেন না?—মনে মনে ভাবেন নরেন্দ্র। দারিদ্র্যে ও অভাবে ভুবনেশ্বরীর মন এতদূর পর্যন্ত ভেঙে গিয়েছিল যে একদিন সকালে নরেন যখন ভগবানের নাম মুখে নিয়ে ঘুম থেকে উঠলেন, তখন সেই কথা কানে যেতেই ভুবনেশ্বরী দেবী ধমক দিয়ে ওঠেন—"কেবল ভগবান, ভগবান; ভগবান তো সব করলেন।"

নরেন নির্বাক। দারিদ্র্য কী ভীষণ জিনিস। অমন ভক্তিমতী যে তাঁর মা, তাঁর মন পর্যন্ত বিরূপ হয়ে উঠেছে আজ অভাবের তাড়নায়। এমন সময়ে তিনি একদিন খবর পেলেন যে,

রামকৃষ্ণ এসেছেন কলকাতায় এক ভক্তের বাড়িতে। নরেন গেলেন তাঁকে দেখতে।

—কতদিন যাস্‌নি ওখানে: কাল আসিস্, বললেন রামকৃষ্ণ নরেনকে। কথায় স্নেহ ঝরে। সে স্নেহ-স্পর্শ করে তাঁর হৃদয়। এলেন তিনি দক্ষিণেশ্বরে। পরমহংসদেব বসে আছেন স্থির হয়ে, চোখ বুঁজে। দুই চোখ দিয়ে ঝরছে করুণার পূতধারা। সেদিন নরেন আর বাড়ি ফিরলেন না। রাতটা ওখানেই কাটালেন। রাতের নির্জন প্রহরে তাঁর ইষ্টদেব তাঁকে নানা রকম সান্ত্বনা ও উপদেশ দিলেন। সেই রাতে ভাবাবিষ্ট চিত্তে রামকৃষ্ণ সর্বপ্রথম নরেন্দ্রকে বললেন,—"মনে রাখিস আর পাঁচজনের মত জীবন যাপন করবার জন্য তোর জন্ম হয়নি। তোর জীবনের উদ্দেশ্য মহান্। মা তোকে দিয়ে অনেক কাজ করাবেন।"

বিশ্বাস করলেন কিনা না করলেন, রামকৃষ্ণের এই কথা শুনে নরেনের মন সেদিন একটা অভূতপূর্ব আনন্দে ভরে উঠল। একটা নূতন চেতনা নিয়ে তিনি ফিরলেন দক্ষিণেশ্বর থেকে।

পাঁচ

"মা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে দত্ত বাড়ির ঐ ছেলেটির মধ্যে জ্ঞানসূর্য জ্বল্ জ্বল্ করছে।"

রামকৃষ্ণের মুখের এই কথাটি মনের মধ্যে যতই আলোচনা করেন, ততই যেন যুবক নরেন্দ্রনাথ এক নূতন জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ হোয়ে উঠতে থাকেন। তিনি আরো বলেছেন, তাকে দিয়ে একদিন পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে। নরেন্দ্রনাথের যে অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের গৌরবময় ছবিটি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, তা মিথ্যে হয়নি।

একদিন জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত, নিরাশায় বিপর্য্যস্ত নরেন্দ্রনাথ এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

—কিরে, আবার যে এলি ?

—না এসে থাকতে পারলাম না।

—তা হোলে আমাকে তুই ভালবাসিস্, বল।

—তা জানি না, তবে আপনার কথা শুনতে ভালো লাগে।

—যা বলি তার একটাও কিন্তু আমার কথা নয়। আমি তো আকাট মুখ্খু। মা আমার মুখ দিয়ে ঐসব কথা বলান।

আসল কথা, সেদিন নরেনের এক বন্ধু তাঁকে একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন ; বলেছিলেন, নরেন, তুই ওখানে একবার যা। রাণী

রাসমণির জামাই মথুরবাবু ঠাকুরকে কত ভক্তি করেন। ওঁরা কত বড়লোক, টাকার অবধি নেই ওঁদের। ঐ দক্ষিণেশ্বরের মন্দির রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। ঠাকুরকে গিয়ে তোর অবস্থার কথা সব খুলে বলিস্—একটা না একটা উপায় উনি করে দেবেন, এ আমার বিশ্বাস।"

বিশ্বাস নরেনেরও আছে। তাই আজ ঠাকুরকে নিরিবিলি পেয়ে সোজাসুজি কথাটা উত্থাপন করলেন। বললেন, "ঠাকুর, ভগবান যদি থাকেন তিনি মাথায় থাকুন। সংসারের চিন্তায় এখন আমি অস্থির।"

—তা আমায় কি করতে বলিস্ তুই ?

—ঐ যে মন্দিরে আপনার মা আছেন, ওঁকে বলুন না একটু আমার দিকে মুখ তুলে চাইতে যাতে আমাদের ছু'বেলা ছু'মুঠো ভাত জোটে।

সরল প্রাণ যুবকের কথাগুলো রামকৃষ্ণের হৃদয়কে স্পর্শ করলো। তিনি বললেনঃ "ওরে, আমি যে কোনোদিন মায়ের কাছে কিছু চাইনি—চেয়েছি শুধু ভক্তি; বলেছি, মা, আমার বিচার-বুদ্ধির মাথায় বজ্রাঘাত দে। তবু সেদিন রামের মুখে তোদের অবস্থা শুনে তোদের যাতে একটু সুবিধা হয়, সেজন্য মা-কে বলেছিলাম।"

—বলেছিলেন ? নরেনের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে অপার বিস্ময়।

—হ্যাঁ, রে বলেছিলাম। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জানিস, তুই যে মা-কে মানিস না, তাই 'না মা তোর কথায় কান দেন না।

—আমি যে নিরাকারবাদী।

—ওরে সাকারও সত্যি, নিরাকারও সত্যি।

—বলেন কি?—সাকার নিরাকার সব একাকার?

—দুয়ে মিলেই তো অখণ্ড ব্রহ্ম। ঐ যে মন্দিরে আমার মা আছেন, উনি চিন্ময়ী। যা, আজ মঙ্গলবার, মা-কে ভক্তি ভরে প্রণাম করে ওঁর কাছে যা চাইবি তাই পাবি।

ঠাকুর মিথ্যা বলেন না। এই সুবর্ণ সুযোগ। সংসারের দুঃখ, মায়ের চোখের জল আর সহ্য হয় না। গভীর রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ। মন্দিরের সিঁড়ি ভেঙে ধীরে মন্থর পদক্ষেপে নরেন্দ্রনাথ চলেছেন রামকৃষ্ণের ইষ্টদেবীর কাছে। অদূরে নিঃশব্দে প্রবাহিত গঙ্গার স্রোতোধারা—কল্‌কল্‌, ছল্‌ছল্‌; ওপরের আকাশে অসংখ্য তারার ঝিকিমিকি। চরাচর নিস্তব্ধ। মন্দিরের চাতালে এসে দাঁড়ালেন নরেন্দ্র। তাঁর বুক দুরু দুরু করছে; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রবল হচ্ছে; নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত এবং ঘন ঘন। ঘিয়ের শেজ জ্বলছে মন্দিরের মধ্যে। তারই স্তিমিত আলো এসে পড়েছে দেবীর মুখে। নিস্প্রাণ পাষাণময়ী প্রতিমা, কিন্তু অতি প্রসন্ন বদন। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে নরেন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন সেই প্রতিমার সম্মুখে যুক্তকরে। সন্দেহ আর সংশয়ের দোলায় দুলছে তাঁর মন। তবু কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি সেই দেবী-মূর্তির পানে। কী প্রশান্ত মূর্তি!

রাত্রির এক প্রহর তখন উত্তীর্ণ হয়েছে।

সহসা সেই অবিশ্বাসী যুবক দেখলেন মায়ের ভুবনমোহন রূপে মন্দিরের ভেতরটা আলোয় আলোকিত। বরাভয় করখানি প্রসারিত করে মা যেন অসীম স্নেহভরে তাকিয়ে আছেন। 'এতো প্রস্তরময়ী মূর্তি নয়—এ যে সাক্ষাৎ চিন্ময়ী প্রতিমা। যুবকের অন্তরে জাগে এক অদ্ভুত শিহরণ—একটা আশ্চর্য অনুভূতি। তাঁর জাগতিক চৈতন্য লোপ পেল—সাময়িকভাবে তিনি হারিয়ে ফেললেন তাঁর বিচার-বুদ্ধি, তাঁর নাস্তিক্যভাব। বলে উঠলেন আকুল কণ্ঠে:

"মা, বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান আর ভক্তি দাও আমাকে। আমি আর কিছু চাই না।"

ফিরে এলেন তিনি রামকৃষ্ণের কাছে আবিষ্টের মতো।

—কী রে, মা-র কাছে চাইলি কিছু ?

তখন নরেনের খেয়াল হোল, তিনি আগের অবস্থা ফিরে পেলেন। বললেন—না, চাইনি ত কিছু।

—তবে যা, আর একবার গিয়ে চাইগে যা।

সেদিন রাত্রিতে বারবার তিনবার মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য মুখ ফুটে চাইতে পারলেন না নরেন্দ্রনাথ। তখন রামকৃষ্ণ নিজে থেকে তাঁর মানসপুত্রকে বললেনঃ "তুই যখন চাইতে পারলি না, তখন তোর কপালে সংসারসুখ নেই। তবে মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব তোদের কখনো হবে না।"

সেদিন থেকে আরম্ভ হোল নরেন্দ্রনাথের জীবনে এক নূতন অধ্যায়।

দক্ষিণেশ্বরের অর্ধশিক্ষিত মাতৃ-পূজারী রামকৃষ্ণদেবের চরণে নরেন্দ্রনাথ সঁপে দিলেন নিজেকে। তারপর মানসপুত্রকে ধীরে ধীরে গড়ে তুললেন তিনি। একা নরেন নয়, একে একে ঈশ্বর-প্রাণ সমবয়সী আরো কয়েকটি ভক্ত এলেন—এলেন রাখাল মহারাজ, কালী মহারাজ, মহাপুরুষ শিবানন্দ, সারদানন্দ এবং আরো অনেকে। এই সব ছেলেদের জন্যেই বুঝি এতদিন অপেক্ষা করছিলেন রামকৃষ্ণ। ক্রমে কঠোর সাধনার ফলে এঁরা সবাই এগিয়ে চলেন আধ্যাত্মিক পথে। বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার, পাণ্ডিত্যের অভিমান সব কিছু মিলিয়ে যায় এঁদের অন্তর থেকে। এঁরা সবাই রামকৃষ্ণের সন্তান ; সংসার, সংসারের সুখ এঁদের জন্য নয়।

এঁদের ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষে আসবে একটি নবযুগ—এই ধারণা আজ এঁদের প্রত্যেকের অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছে।

১৮৮৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে রামকৃষ্ণের অসুখ করলো। নরেন, রাখাল, শরৎ, শশী, তারক প্রভৃতি তাঁর যুবক ভক্তগণ প্রাণ দিয়ে সেবা করেন ঠাকুরের। দক্ষিণেশ্বরে অসুখ বাড়লো। সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে আসা হোল কাশীপুরের বাগান বাড়িতে। গুরুসেবায় ভক্তরা মনপ্রাণ ঢেলে দেন। ওষুধপত্র, চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটী নেই, কিন্তু রোগ ক্রমে বেড়েই চললো। নিজের শক্তি তাঁর তরুণ শিষ্যদের মধ্যে সঞ্চারিত করে রামকৃষ্ণদেব যে এইবার পৃথিবী পরিত্যাগ করবার আয়োজন করছেন, কেউ তা বুঝতে পারেন নি। এইসময়ে একদিন নরেনকে কাছে ডেকে ঠাকুর বললেনঃ "আমার সাধনা ও সিদ্ধি আজ থেকে তোকে দিয়ে গেলাম।"

—কিন্তু আমি চাই নির্বিকল্প সমাধি, বলেন নরেন্দ্র।

—তাও লাভ হবে তোর। তবে এখন নয়, পরে। এখন বহুজনের হিতের জন্য তোকে কাজ করতে হবে—সেই অসাধ্য সাধনের শক্তি তোকে আমি দিয়ে গেলাম।"

১৮৮৫, ১৫ই আগষ্ট, রবিবার।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দেহত্যাগ করলেন।

বরানগর। সুরেন মিত্তিরের বাড়ি।

ঠাকুর মারা যাবার ক'দিন পরেই তামার কলসীতে ভরে তাঁর পবিত্র দেহভস্ম মাথায় ধারণ করে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ শিষ্যগণ কাশীপুর বাগান বাড়ি থেকে উঠে এলেন বরানগরে। সকলের ভার এখন নরেনের ওপর। তিনিই এখন সকলের আশা ও ভরসার পাত্র। রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে একটা বিপুল সংঘ গড়ে তুললেন

তিনি আর রামকৃষ্ণ-নামের পতাকা কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি বেরুলেন ভারত ভ্রমণে। অনেক দুঃখ, অনেক অভাব আর অনেক কষ্টের ভেতর দিয়ে তাঁদের সেই বরানগরের দিনগুলো কেটেছিল। বিরাম নেই, আলস্য নেই, সব সময়ে গুরুভাইদের উৎসাহ দিয়ে নরেন্দ্র এইসময় তাঁদের কতদিন বলতেন; "জয় রামকৃষ্ণ! মানুষ গড়ে তোলাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হোক। মনে রেখো, এই আমাদের একমাত্র সাধনা।"

দিন যায়। বরানগরের মঠে ঈশ্বর-আলোচনা আর ধর্মচিন্তা নিয়ে দিন কাটে রামকৃষ্ণ-সন্তানদের। দিনরাত পূজা-অর্চনা, ধ্যান-ধারণা, জপ-তপ, শাস্ত্র-পাঠ এইসবের মধ্যে তাঁরা তন্ময় হয়ে রইলেন সর্বক্ষণ। এ এক বিচিত্র জীবন, বিচিত্র অনুভূতি। মাঝে মাঝে অভিভাবকেরা আসেন এঁদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। এগিয়ে আসেন নরেন্দ্রনাথ তাঁদের বাধা দিতে। তাঁদের সঙ্গে জোর গলায় তর্ক করেন তিনি; বলেন—"আমরা সবাই রামকৃষ্ণের সন্তান; আমাদের আদর্শ সন্ন্যাসীর পবিত্র জীবন। মহাসমন্বয়ের বার্তা আমরা প্রচার করব—আমরা রামকৃষ্ণের পতাকাবাহী সন্তান-সংঘ। দেশের কল্যাণে সার্থক হবে আমাদের জীবন।" কী জ্বলন্ত বিশ্বাস। ললাটে উদ্ভাসিত কী অপূর্ব মহিমার জ্যোতি। অভিভাবকগণ ফিরে যান ব্যর্থ মনোরথ হয়ে।

১৮৮৮।

বরানগরের মঠ থেকে তীর্থ ভ্রমণে বেরুলেন নরেন্দ্রনাথ।

এখন থেকে পাঁচ বছর কাল তিনি পরিব্রাজকের জীবন যাপন করেন। সারা ভারতবর্ষই তিনি একরকম কপর্দকশূন্য অবস্থায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। অদ্ভুত সেই জীবন। এখন আর তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত নন—স্বামী বিবেকানন্দ, এই নামেই তিনি ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে পরিচিত হলেন।

গৈরিকধারী সন্ন্যাসী একা চলেছেন ভারতের পথে পথে।

তাঁর মহিমাব্যঞ্জক মূর্তি, সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, তপোজ্জ্বল প্রশান্ত বদন সকলেরই মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করত। প্রথমে তিনি এলেন শিবধাম কাশীধামে। মঠ ও মন্দিরে সুশোভিত পুণ্য বারাণসী তীর্থ দর্শন করে মুগ্ধ হোলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কাশীর পাশ দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রবাহিত কলুষনাশিনী গঙ্গা। গঙ্গার তীরে অসংখ্য ঘাট, ঘাটে অসংখ্য প্রস্তর সোপানাবলী। সাধু-কণ্ঠের স্তবস্তুতি ও পূজা-আরাধনায় সর্বদা মুখরিত কাশীর ঘাট। রামকৃষ্ণদেব একবার এসেছিলেন এই কাশীধামে। সেই স্মৃতি জেগে ওঠে তাঁর মনে। মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির পবিত্র ধ্বনি। কাশীতে এসে তিনি একদিন গঙ্গার তীরে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দর্শনলাভ করে ধন্য হলেন। এঁর অদ্ভুত ত্যাগ ও তপস্যার কথা তিনি কতদিন ঠাকুরের কাছে শুনেছিলেন। কাশীতে তখন আরেকজন বিখ্যাত সন্ন্যাসী বাস করতেন। নাম স্বামী ভাস্করানন্দ। একদিন কথায় কথায় তিনি বিবেকানন্দকে বললেন: "এই পৃথিবীতে কেউই পুরোপুরি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে পারে না।"

প্রতিবাদ করলেন বিবেকানন্দ এই কথার। বললেন: "বলেন কি সাধুজী? আমি অন্ততঃ একজনকে জানি, যিনি কাম-কাঞ্চনের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ জয় করতে পেরেছিলেন। তিনি এই অধমের ইষ্টদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।"

কাশী থেকে বিবেকানন্দ ফিরে এলেন বরানগর মঠে। ফিরে এসে তিনি তাঁর গুরুভাইদের বললেন, "ভারতবর্ষের হৃদ্‌পিণ্ড কাশীধাম ঘুরে এসে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, এবার আমাদের প্রচারকার্যে নামতে হবে। কিন্তু তার আগে দেশটাকে আরো ভালো করে দেখতে হবে আমাদের। বুঝতে হবে দেশের

লক্ষ কোটী মানুষের জীবনে আজ কত বেদনা জমে উঠেছে ; জানতে হবে এদের অভাবের করুণ ইতিহাস। যাও, তোমরা সব বেরিয়ে পড়ো গুরুর নাম সম্বল করে। মনে রেখো, ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণব্রতের সাধনাই আমাদের প্রকৃত সাধনা —মোক্ষ নয়, মুক্তি নয়।"

সকলের অন্তর স্পর্শ করলো স্বামিজীর এই সুন্দর কথাগুলি। গুরুভাইরা সবাই এক মন, এক প্রাণ। তাঁদের নেতা বিবেকানন্দ। এই নবীন সন্ন্যাসীর দল তাঁদের নেতাকে সামনে রেখে নামলেন লোকসেবার কাজে। ভারতবর্ষ ভ্রমণে তাঁদের প্রায় সকলেই বেরিয়ে পড়েন একে একে। বিবেকানন্দও আবার বেরুলেন। এলেন কাশী। এখান থেকেই শুরু হয় পরিব্রাজকের ভারত পরিক্রমা। দণ্ড আর কমণ্ডলু হাতে নিয়ে উত্তর ভারতের নানা স্থানের ভেতর দিয়ে তিনি এলেন সীতারামের স্মৃতিপূত অযোধ্যায়। তারপর লক্ষ্ণৌ, আগ্রা হোয়ে পায়ে হেঁটে তিনি এলেন কৃষ্ণলীলার স্মৃতি বিজড়িত শ্রীবৃন্দাবন ধামে। বৃন্দাবনের পথে একটি ঘটনা।

কলেজে পড়তেই স্বামীজি তামাক ধরেছিলেন। আগ্রা থেকে একটানা ত্রিশ মাইল পথ হেঁটে ক্লান্তি বোধ করলেন তিনি। এ সময় একটু তামাক পেলে মন্দ হোত না, ভাবলেন সন্ন্যাসী। দৃষ্টি পড়ে পথের এক পাশে যেখানে একমনে চোখ বুঁজে একজন লোক তামাক টানছিল। লোকটির কাছে এসে স্বামীজি বলেন, "ভাই, এক ছিলিম তামাক খাওয়াতে পারো।" চোখ মেলে লোকটি তাকিয়ে দেখে—দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে এক সন্ন্যাসী। সে একটু সংকোচ বোধ করে ; বলে—"আমি মেথর।" হুঁকোটা ধরবার জন্য স্বামীজি হাতটা একটু বাড়িয়েছিলেন, 'মেথর' এই কথাটা শুনেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন, হাত গুটিয়ে নিলেন। মেথর যে ছোটজাত, অস্পৃশ্য। তবে তো এর ছোঁয়া

তামাক চলবে না। এগিয়ে চলেন তিনি। দু'পা যেতেই বিবেকানন্দের যেন চমক ভাঙলো। আমি না শিখাসূত্র নামগোত্র সব ত্যাগ করে, জাতিকুলের অভিমান বিসর্জন দিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছি—তবে কেন মেথরের হাত থেকে তামাক খেতে ইতস্ততঃ করলাম? এ কী আত্মপ্রবঞ্চনা—এ কী জাতি-অভিমান।" বিবেকানন্দ ফিরলেন। মেথরের কাছে এসে বসলেন। বললেন, "দাও ভাই, তোমার ঐ কলকেটা দাও।" মনের আনন্দে মেথরের সাজা এক ছিলিম তামাক খেলেন তিনি।

গাজিপুর।

এখানকার বিখ্যাত সাধু পওহারী বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বিবেকানন্দ। তিনি শুনেছিলেন পওহারী বাবা যোগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। যোগ শিখবার খুব ইচ্ছা হোল তাঁর। বাবাজী রাজী হলেন। গভীর রাতে তাঁর গুহায় যাবার জন্য স্বামিজী প্রস্তুত হলেন--অমনি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় একটি জ্যোতির্ময় মূর্তি। রোমাঞ্চিত কলেবরে বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ করলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরই ইষ্টদেব--রামকৃষ্ণ। তিনি নিরস্ত হলেন।

এরপর হিমালয়ের নীচে হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি যেসব তীর্থস্থান আছে সেগুলি তিনি দর্শন করলেন। হৃষীকেশের স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। এখানকার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে তাঁর লেখা 'পরিব্রাজক' বইতে। স্বামিজী লিখেছেন: "হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখনা গোনা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদু হিমশীতল গাঙ্গং বারি মনোহারি আর সেই অদ্ভুত হর্ হর্ হর্ ধ্বনি, সাম্‌নে গিরি নির্ঝরের হর্ হর্ প্রতিধ্বনি।" এখান থেকে তিনি এলেন আলোয়ার। আলোয়ারের মহারাজা মঙ্গল সিংহ বাহাদুরের আতিথ্য গ্রহণ করেন তিনি। এই দিব্যকান্তি

সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে মহারাজা এতদূর মুগ্ধ হলেন যে তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। আলোয়ার থেকে জয়পুর। উত্তর-পশ্চিম ভারত ভ্রমণ শেষ করে বিবেকানন্দ অবশেষে এলেন দক্ষিণ ভারতে।

এইভাবে পাঁচবছর ধরে পরিব্রাজকরূপে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করলেন। প্রত্যক্ষ করলেন দেশের অতীত ও বর্তমানকে। এই কয়েক বছরে যুবক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের চিন্তা ও চরিত্রে দেখা দিল এক আশ্চর্য পরিবর্তন। এই ভারতভ্রমণ তাঁর বৃথা হয়নি; এরই ভেতর দিয়ে তিনি জাতীয়জীবনের সত্যকার পরিচয় লাভ করলেন। সেই পরিচয় তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নির্দেশ করে দিল। হিমালয় থেকে কুমারিকা—অশ্রান্ত ভ্রমণে ক্লান্ত সন্ন্যাসী অবশেষে একদিন ভারতমহাসমুদ্রের তীরে ভারতের শেষ প্রস্তরখানির ওপর বসলেন। সেইখানে বসে নব্যভারতের মন্ত্রগুরু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ দেখলেন সাম্নে নীল সমুদ্র, পেছনে ভারতবর্ষ। স্বদেশের অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভেসে ওঠে তাঁর ধ্যানে।

এই আমার স্বদেশ, আমার ভারতবর্ষ। নিরন্ন বুভুক্ষু ভারতবর্ষ —আমার প্রিয় জন্মভূমি। রোগে জর্জর, ক্ষুধায় ক্লিষ্ট, ছিন্নবাস-পরিহিত কোটি কোটি নর-নারীর মিছিল যেন তাঁর দৃষ্টি পথে ধরা দেয়। সন্ন্যাসীর দুই চোখ জলে ভরে ওঠে। চকিতে কর্তব্য স্থির করে ফেলেন বিবেকানন্দ। ধর্ম নয় -ভারতের ঐহিক উন্নতি সাধনই আজ থেকে হবে তাঁর জীবনব্রত। বর্তমান ভারতের ইহাই দরকার। এই কাজেই তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করবেন, মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করেন সন্ন্যাসী।

মনে পড়ল পোরবন্দরের সেই পণ্ডিত অধ্যাপকের কথা, যিনি তাঁকে একদিন বলেছিলেন, "স্বামিজী আপনি পাশ্চাত্য দেশে যান; আপনার দেশের লোকের চেয়ে তারা আপনাকে ভালো বুঝবে।

ভারতের দরকার পাশ্চাত্যের যন্ত্র-বিজ্ঞান; পাশ্চাত্যের দরকার ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞান। এই আদান-প্রদানের পথ তৈরী করতে হবে। এ কাজ আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আমেরিকার চিকাগো শহরে আসন্ন বিশ্বধর্ম মহাসভার কথা। রামনাদের রাজা-ই তাঁকে -এর কথা বলেছিলেন এবং এই সম্মেলনে যোগদান করবার জন্য তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। কন্যাকুমারিকা থেকে তিনি এলেন মাদ্রাজে। মাদ্রাজ তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানালো। তখন তাঁর হৃদয়ে জেগেছে পুঞ্জীভূত শক্তির বিপুল তরঙ্গ, স্বদেশপ্রেমের তীব্র ব্যাকুলতা আর জীবনব্রত খুঁজে পাওয়ার আনন্দ। তাই মাদ্রাজ-বাসীর কাছে তিনি সর্বপ্রথমে তাঁর মনের কথা খুলে বললেন। দলে দলে শিক্ষিত যুবকেরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। একটা প্রবল উদ্দীপনা জাগল তাদের অন্তরে এই সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে। তারাই উদ্যোগী হয়ে স্বামিজীকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি করে চিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে পাঠায়। তারাই জনসাধারণের কাছ থেকে ভিক্ষা করে সংগ্রহ করে তাঁর পাথেয়।

তারপর ১৮৯৩ সালের ৩১শে মে বোম্বাই থেকে জাহাজে চড়ে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাত্রা করলেন। নতুন অভিযানে বের হোলেন ভারতপ্রেমিক সন্ন্যাসী। ভারতের চিন্তা, ভারতবাসীর চিন্তায় তখন পরিপূর্ণ তাঁর হৃদয়। আরম্ভ হোল তাঁর জীবনের গৌরবময় অধ্যায়।

কন্যা কুমারিকায় 'বিবেকানন্দ রক্'

১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে একদিন স্বামিজী এই শিলার উপর ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন। এইখানে তাঁর একটি প্রস্তর মূর্তি স্থাপিত হবে।
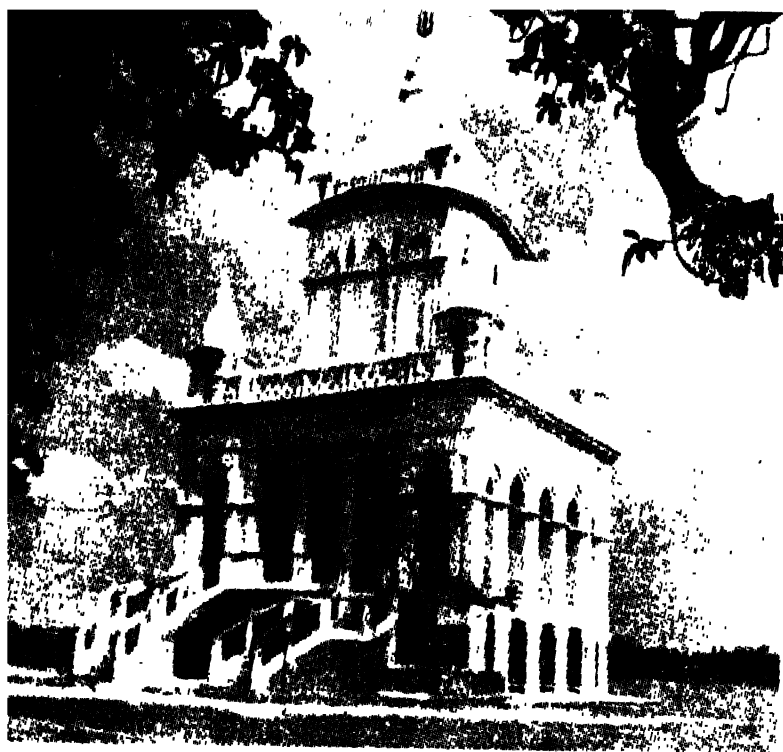
বিবেকানন্দ মন্দির, বেলুড় মঠ

চিকাগো।

আমেরিকার বিখ্যাত শহর চিকাগো।

সেই শহরে এসে উপনীত হোলেন স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালের জুলাই মাসে। মহাধর্মসম্মেলন আরম্ভ হবার তখনো অনেক দেরী। এইখানে এই সম্মেলনের গোড়ার কথা একটু বলি।

১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগোতে একটা বিশ্ব মেলা বসেছিল। ধর্মসম্মেলনটি ছিল এই মেলারই অঙ্গ। তখন উনিশ শতকের শেষ হয়-হয়। এই একশো বছরের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ কতদূর উন্নত হয়েছে, তারই একটা পরিচয় এই মেলায় নানাভাবে প্রদর্শিত হবার ব্যবস্থা হয়। মেলার কর্মকর্তাগণ সেই সঙ্গে ভাবলেন যে আর একটি কাজ করলে ভালো হয়; সভ্য মানুষ আধ্যাত্মিক চিন্তায় কতদূর এগিয়ে গেছে, তারো একটা প্রতিনিধি-মূলক প্রদর্শনী করতে পারলে মন্দ হয় না। এই উদ্দেশ্য নিয়েই বিশ্বধর্মসম্মেলনের (পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়নস) একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আরম্ভ হবার পর থেকে একাদিক্রমে সতের দিন ধরে এই সম্মেলনের অধিবেশন চলেছিল। এর পরিকল্পনা যিনি করেছিলেন তাঁর নাম চার্লস ক্যারোল বনি। এই মেলা ও ধর্মসম্মেলনের আয়োজন সম্পূর্ণ করতে সময় লেগেছিল আড়াই

বছর। এই ধর্মসম্মেলন এমন চমৎকার হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত চিকাগোর বিশ্বমেলায় এইটাই দর্শকদের কাছে প্রধান আকর্ষণের বিষয় হোয়ে উঠেছিল। মেলায় দেশ-বিদেশের হাজার হাজার দর্শকের সমাগম হয়েছিল। আর হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় প্রচলিত ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা এই ধর্মসম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছিলেন।

ভারতবর্ষ থেকে যাঁরা নিমন্ত্রিত হোয়ে এই বিশ্বধর্মসম্মেলনে যোগদান করেন তাঁদের নাম : (১) স্বামী বিবেকানন্দ (হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি); (২) জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী (থিয়োজফি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি) ; (৩) বীরচাঁদ গান্ধী (জৈনধর্মের প্রতিনিধি); (৪) বি. বি. নগরকার ও (৫) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধি) ; এবং (৬) ভিক্ষু ধর্মপাল (বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধি)। সর্বসমেত পৃথিবীর এই দশটী প্রধান ধর্মের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন এই সম্মেলনে, যথা (১) ইহুদী ; (২) ইসলাম ; (৩) হিন্দু ; (৪) বৌদ্ধ ; (৫) তাওইনম্ ; (৬) কনফুসীয় ; (৭) সিন্টো ; (৮) জরোথুস্ত্রীয় ; (৯) রোমান ক্যাথলিক এবং (১০) প্রোটেস্ট্যান্ট খৃষ্টানধর্ম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মোট ছ'হাজার প্রতিনিধি সেদিন এই সম্মেলনে সমাগত হয়েছিলেন। এর আগে পৃথিবীতে ঠিক এই ধরণের সম্মেলন আর কখনও হয় নি।

তবে একটা কথা বলে রাখা ভালো। স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক নিমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসাবে চিকাগোতে আসেন নি। ব্যাপারটা হোয়েছিল এইরকম। যখন তিনি ভারতবর্ষের পথে পথে পরিব্রাজকরূপে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখনই এক মাদ্রাজী অধ্যাপক —আলাসিঙ্গা পেরুমল—তাঁকে এইখানে আসবার জন্য উৎসাহিত করেন এবং তিনিই স্বামিজীর পাথেয় সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

খেতড়ির মহারাজাও এই ব্যাপারে তাঁকে খুব সাহায্য করেন। ত্রিশ বছর বয়স তখন স্বামী বিবেকানন্দের যখন তিনি বিদেশ যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি চিকাগোতে এসে শুনলেন যে ধর্মমহাসভার তখনো তিন মাস দেরী আর সেখানে তাঁর প্রবেশের কোনো সুযোগই নেই। কারণ তিনি তো এই ধর্মমহাসভাব পক্ষ থেকে কোনো নিমন্ত্রণ পান নি। প্রতিনিধি হবার সময়ও তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সম্মেলন বসবে সেপ্টেম্বরে, তখন সবে জুলাই মাস। টাকা পয়সাও ফুরিয়ে এসেছে। প্রতিদিন পনর টাকা করে খবচ হোত। কি করা যায়? একদিন একজন পরামর্শ দিলেন—বোষ্টন শহরে যান, সেখানে কম খরচে থাকতে পারবেন।

এলেন বোষ্টনে।

মন্ত্রেব সাধন কিম্বা শরীর পাতন—এই অগ্নিময় বিশ্বাস বুক নিয়ে তিনি যখন বোষ্টনের পথে চলেছেন তখন ভাগ্যক্রমে একজন মহিলার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। মহিলাটির অন্তর করুণায় পূর্ণ; খুব বড়লোক। তিনি এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করে খুশী হলেন এবং তাঁকে তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। মহিলাব নাম মিস কেটি স্যানবোর্ণ। বয়স চুয়ান্ন। বিদুষী ও সুলেখিকা। শহরের উপকণ্ঠে 'ব্রিজি মেডোস' নামে ছায়াঘেরা সুন্দর তাঁর বাড়িটি। পাইন গাছ আর আইভি লতায় ঘেরা এবং নানা রকমেব ফুলে ভরা বাড়িটির মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ সন্ন্যাসীকে মুগ্ধ করে। তাব চেয়েও মুগ্ধ হলেন তিনি মহিলাটির আতিথেয়তায়।

এইখানে আসার কিছুদিন পরে অধ্যাপক জন হেনরি রাইট ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হোল বিবেকানন্দের। রাইট সাহেব হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক। এই রাইট দম্পতী পরে স্বামিজীকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন

এবং তিনি যাতে চিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন, সে বিষয়েও তাঁরা তাঁকে খুব সাহায্য করেছিলেন। এই রাইট পরিবারের সকলেই তাঁর খুব অনুরাগী হয়েছিলেন এবং বিবেকানন্দকে তাঁরা 'আমাদের স্বামীজি' বলে ডাকতেন।

দিন যায়।

ক্রমেই ধর্মসম্মেলনের দিন এগিয়ে আসে।

কিন্তু তখনো পর্যন্ত তিনি কিভাবে এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে যোগদান করবেন তা বিবেকানন্দ বুঝে উঠতে পারলেন না। পরিচয়-পত্র নেই, অর্থের সম্বলও ফুরিয়ে আসছে। দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়লেন তিনি। নিরুপায় বিবেকানন্দ তাঁর মাদ্রাজী শিষ্যদের কাছে টাকা আর পরিচয়-পত্রের জন্য চিঠি লিখলেন। এক অদম্য আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি দিনগুলি অতিবাহিত করেন। দেখতে দেখতে আগষ্ট মাস শেষ হয়ে এলো। এই সময়ে একদিন বৃদ্ধ অধ্যাপক রাইট তাঁকে বললেন, "আপনি এই সম্মেলনে যোগদান করুন।"

—তার তো কোন উপায় দেখছিনে।

—ভারতবর্ষের কোন্ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী আপনি?

—গুরু আমার রামকৃষ্ণ আর ইষ্ট আমার স্বদেশ ভারতবর্ষ। আমি একজন হিন্দু-সন্ন্যাসী। পরিচয়-পত্রের জন্য আমার শিষ্যদের কাছে চিঠি লিখেছি।

—ঠিক আছে। সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ভার আমারই এক বন্ধুর ওপর আছে। তাঁর নামে আমি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি আপনাকে। আপনি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন।

এই অপ্রত্যাশিত সাহায্যের মধ্যে বিবেকানন্দ যেন দেখতে পেলেন তাঁর গুরুর অদৃশ্য আশীর্বাদ।

ধর্মসম্মেলন আরম্ভ হবার ঠিক দুদিন আগে স্বামিজী এলেন চিকাগো শহরে। এসেই তিনি এক বিপদের মধ্যে পড়লেন। অধ্যাপক রাইট যে ভদ্রলোকের নামে চিঠিখানা দিয়েছিলেন, সেটা তিনি আর খুঁজে পান না। চিঠিতেই ঠিকানাটা ছিল। উদ্বিগ্ন হোলেন তিনি। এতবড় শহরে কোথায় তিনি তাঁর খোঁজ করবেন। দু'চারজনকে জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু তাদের কেউই বলতে পারে না। সন্ধ্যার সময় পথের ধারে একটি বেঞ্চির ওপরে বিষণ্ণ মনে বসে আছেন স্বামিজী। বসে বসে ভাবছেন—তবে কি ধর্মসম্মেলনে তাঁর যোগদান করা রামকৃষ্ণদেবের ইচ্ছা নয়? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেদিনের কথা যেদিন তিনি সন্ধ্যায় কন্যাকুমারিকার মন্দিরে ধাপে বসে ধ্যান করছিলেন। সম্মুখে ভারত মহাসমুদ্র, পিছনে ভারতবর্ষ। সেই সমুদ্রের ফেনায়িত তরঙ্গের ওপর তিনি কি রামকৃষ্ণদেবের জ্যোতির্ময় মূর্তিখানি দেখতে পাননি? সেই মূর্তি কি তাঁকে অঙ্গুলি সংকেতে এই মহাদেশে আসবার জন্য বলেন নি? ক্লান্ত হয়ে হতাশ মনে বসে বসে যখন তিনি মনের মধ্যে এইসব কথা চিন্তা করছিলেন, তখন—ঠিক সেই মূহূর্তে, তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন এক অপরিচিতা ভদ্রমহিলা। তিনি নিজে থেকেই সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি কি ধর্মমহাসম্মেলনের একজন প্রতিনিধি?

—ঠিক প্রতিনিধি নই। প্রতিনিধি হবার জন্য এসেছি।

—তবে এখানে বসে আছেন কেন? আর একদিন বাদেই তো সম্মেলন আরম্ভ হচ্ছে।

তখন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে সব কথা খুলে বললেন।

মহিলাটির অন্তর স্পর্শ করলো তাঁর কথাগুলি। তিনি সাগ্রহে এবং পরম সমাদরের সঙ্গে তাঁকে নিয়ে এলেন তাঁর বাড়িতে। বললেন, "আপনার কোনো দুশ্চিন্তা নেই, আমি সব ব্যবস্থা করে

দেব।" এই ভদ্রমহিলাটির নাম শ্রীমতি জর্জ ডাব্লিউ হেল এই হেল-দম্পতি পরে স্বামিজীর অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩।

এইদিন সকালবেলায় চিকাগোতে বিশ্বধর্মসম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হোল। বিবেকানন্দের জীবনে এই দিনটি যেমন স্মরণীয়, ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসেও এ এক অবিস্মরণীয় দিন। বেলা দশটা বাজল। সভার কাজ আরম্ভ হোল। পৃথিবীর দশটি প্রধান ধর্মের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছেন। প্রায় চার হাজার দর্শকের সমাগম হয়েছে। সভার মঞ্চের ওপর বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত প্রতিনিধিরা এসে বসেছেন। মাঝখানে বসেছেন রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রধান পুরোহিত কার্ডিনাল গিবনস্। তাঁর ডান পাশে বসেছেন চীন থেকে সমাগত দশজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আর বাঁ দিকে গ্রীক চার্চের ধর্ম যাজকগণ। জাপানী বৌদ্ধ প্রতিনিধি, সিংহলের বৌদ্ধ প্রতিনিধি, ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধি প্রভৃতি সকলেই তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বসেছেন। আর এঁদের মাঝখানে বসে আছেন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। পরিচয়হীন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। তরুণ বয়স। মুখেচোখে দীপ্তির মহিমা, পরিধানে গেরুয়া রঙের একটা আলখাল্লা আর মাথায় গেরুয়া রঙের একটি বিরাট পাগড়ি। চমৎকার বেশ। সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ তাঁর ওপর।

সভার কাজ আরম্ভ হোল।

সতেরো দিন ধরে চলেছিল এই সম্মেলন।

প্রত্যহ তিনটি করে অধিবশন—সকালে, দুপুরবেলায় আর সন্ধ্যাবেলায়। সর্বপ্রথমে বক্তৃতা দিলেন গ্রীসের আর্চবিশপ। সভাপতির আহ্বানে প্রতিনিধিরা একে একে এসে বক্তৃতা দিতে

থাকেন। সকলেরই তৈরী বক্তৃতা আর সকলের মুখেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মহিমাকীর্তন। বিকেলবেলার অধিবেশনে সভাপতি আহ্বান করলে স্বামী বিবেকানন্দকে। এত বড়ো সভায় হাজার হাজার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কেমন করে বক্তৃতা করবেন? স্মরণ করলেন মনে মনে তাঁর ইষ্টদেব রামকৃষ্ণকে। অমনি প্রেরণার নির্ঝর নেমে এলো তাঁর অন্তরে—জিহ্বাগ্রে। একটা অভূতপূর্ব আবেগে স্পন্দিত হয়ে উঠল তাঁর সমগ্র সত্তা। "সে এক বিচিত্র অনুভূতি", স্বামী বিবেকানন্দ পরে বলেছিলেন, "কি বলব, কেমন করে বলব, এসব কিছুই জানতাম না। সেই হাজার হাজার লোকের সামনে আমার বুক যেন সত্যিই কাঁপছিল। আমাকে বার বার তিনবার ডাকা হয়েছিল বক্তৃতা দেবার জন্য—প্রথম দুবারই আমি সভাপতিকে বলেছিলাম, এখন নয় পরে। শেষবার তিনি যখন আমাকে জানালেন যে এবার বক্তৃতা দিতে না উঠলে আর আমাকে সুযোগ দেওয়া হবে না, তখন স্মরণ করলাম গুরুদেবকে। মনে মনে ভাবলাম, আমি তো তাঁরই আজ্ঞাবহ দাস, আমি ভাববার কে? যিনি আমাকে নানা বাধাবিঘ্নের ভেতর দিয়ে এতদূর নিয়ে এসেছেন তাঁর কথা তিনিই বলবেন। যা বলবার তিনিই আমার মুখ দিয়ে বলাবেন।"

মঞ্চের ওপর এসে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী। দাঁড়ালেন বিজয়ীর ভঙ্গিমায়।

সকল দর্শকের দৃষ্টি এখন তাঁর ওপর।

সকলেই উৎকর্ণ তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য।

সমস্ত সভ্য জগৎ স্বামিজীর কণ্ঠ মারফৎ সেদিন শুনল ভারতবর্ষের হাজার বছরের সভ্যতার কথা, তার সনাতন ধর্মের কথা। সন্ন্যাসীর কণ্ঠকে আশ্রয় করে প্রাচীন ভারত আহ্বান করল নবীন আমেরিকা মহাদেশকে। চকিতে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—"হে আমার আমেরিকাবাসী ভাই-বোনেরা"।

একি আত্মীয়তার সুর বক্তার কণ্ঠে! এমন সম্বোধন আমেরিকা শোনেনি এর আগে। শোনেনি য়ুরোপ। ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হোল সম্মেলনের বিরাট সভাগৃহ। তার মধ্যে ডুবে যায় স্বামিজীর কণ্ঠস্বর। দর্শকবৃন্দের সেই উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনে উৎসাহিত হোয়ে ওঠেন তিনি। আবেগের বেগে তাঁর মুখের উচ্চারিত প্রত্যেকটি কথা যেন হোয়ে উঠল দিব্য বাণী। সে বাণী স্পর্শ করল সকলের হৃদয়—মুহূর্তমধ্যে জয় করল সকলের চিত্ত। পৃথিবীতে এর আগে কিম্বা পরে, আর কোনো বক্তার ভাগ্যে এমন সৌভাগ্যলাভ ঘটেনি।

পরিব্রাজক-জীবনে স্বামিজী গভীরভাবে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর সংস্কৃত উচ্চারণ ছিল বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধ আর উদাত্ত। ধর্মমহাসম্মেলনে প্রথম দিন তিনি যে ছোট্ট বক্তৃতাটি করেছিলেন তার মধ্যে তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র থেকে দুটি সুন্দর শ্লোক উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্যকে পরিষ্কার করে শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতায় বললেন:

"যে ধর্ম জগতকে অন্যের মত সহ্য করতে এবং সকল মতের সর্বজনীনতাকে স্বীকার করতে শিক্ষা দিয়েছে, আমি সেই প্রাচীন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে আজ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। আমি এই ধর্মভুক্ত বলে গৌরববোধ করে থাকি। আমরা কেবল সকল মতই বিশ্বাস করি না, আমরা পৃথিবীর সকল ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি। যে জাতি পৃথিবীর সকল দেশের উৎপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে আশ্রয় দিয়েছে, আমি সেই জাতির একজন বলে গর্ববোধ করি।"

তারপর তিনি দুটি সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করে তাঁর বক্তব্যকে পরিষ্কার করে বললেন; "নদনদী সকল যেমন বিভিন্ন পথ দিয়ে সমুদ্রপানে বয়ে যায়, তেমনি হে প্রভু, সকল ধর্মের অনুগামীদের

তুমিই একমাত্র লক্ষ্য।" দ্বিতীয় শ্লোকটি ছিল গীতার। "যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তার কাছে সেইভাবেই প্রকাশিত হই। সকল মানুষই আমার নির্দিষ্ট পথেই চলে থাকে।"

উপসংহারে তিনি বললেন : "সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, বহুবিধ সংকীর্ণতার ফল হয়েছে ধর্মান্ধতা আর এই ধর্মান্ধতাই অনেক দিন ধরে এই সুন্দর পৃথিবীর ওপর আধিপত্য করেছে। এইগুলি জগতে হিংস্র উপদ্রব করেছে, বার বার একে নরশোণিতে প্লাবিত করেছে, মানব সভ্যতাকে উৎসন্নে দিয়েছে এবং এক-একটি জাতিকে নৈরাশ্যে অভিভূত করেছে। এই ধর্মান্ধতার দানবটা যদি না থাকত, তাহোলে মনুষ্যসমাজ আজকের চেয়ে অনেক, অনেক উন্নত হোত। তবে আমি আশা করি মানুষ তার চরম লক্ষ্যে পৌঁছবেই, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অন্ধকার কেটে যাবেই।"

পাশ্চাত্যজগৎ শুনল এই অভিনব বার্তা।

যখন তাঁর বলা শেষ হোল, হৃদয়ের আবেগে বসে পড়লেন স্বামিজী।

সভাগৃহে আবার প্রতিধ্বনিত হয় ঘন ঘন করতালি ধ্বনি। পরের দিন সব খবরের কাগজে বিবেকানন্দের এই বক্তৃতার প্রশংসা বেরুলো। একদিনেই সারা মার্কিন দেশে ছড়িয়ে পড়ল এই হিন্দু সন্ন্যাসীর নাম। ভিক্ষুকের জয়গানে মুখরিত হোয়ে উঠল সমস্ত আমেরিকা। একদিন যিনি নিতান্ত অপরিচিতের মতন প্রবেশ করেছিলেন এই মহাদেশে, আজ তিনিই হয়ে উঠলেন সবচেয়ে বিখ্যাত। রাস্তায় রাস্তায় বিক্রী হোতে লাগল হাজারে হাজারে তাঁর ছবি—সেই বিচিত্র গৈরিক উষ্ণীষে শোভিত আর গৈরিক বস্ত্র পরিহিত দৃপ্ত সন্ন্যাসীর নয়নলোভন মূর্তি যে একবার দেখে সেই মুগ্ধ হয় আর মনে মনে শ্রদ্ধায় প্রণত হয় তাঁর চরণে।

চিকাগো ধর্মসম্মেলনের বক্তৃতামঞ্চে আরো অনেকেই বক্তৃতা করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে বয়সে প্রবীণ সুপণ্ডিত অনেকেই ছিলেন। তবে তাঁদের প্রত্যেকের চেয়ে বিবেকানন্দের প্রশংসায় ও দেশ পঞ্চমুখ হোল কেন? তার কারণ আর সবাই তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার কথা, তাঁদের মতবাদেব শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেছিলেন; একমাত্র বিবেকানন্দই শোনালেন তাঁর কথা যিনি সকল মানুষের ঈশ্বর, যিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেও কোনো একটা সম্প্রদায়ের নন। প্রথম দিনের বক্তৃতার পর ঐ সম্মেলনে তাঁকে আরো কয়েকটা বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। প্রত্যেকবারই অদ্বৈতবেদান্তের উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবের ওপর ভিত্তি করে নতুন নতুন ভাষায় তিনি প্রচার করলেন এক অপূর্ব বিশ্বধর্ম যার আবেদন সহজেই স্পর্শ করল সকলের হৃদয়। "সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছেন এক ভগবান"—তাঁর কণ্ঠোচ্চারিত এই উদার বাণী নতুন তরঙ্গ তুললো সেদিন পাশ্চাত্য দেশবাসীর মনে।

জৈনধর্মের প্রতিনিধি বীরচাঁদ গান্ধী লিখেছেন: "চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের মতোন সফলতা আর কোনো প্রতিনিধি অর্জন করতে পারেন নি। এই তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসীই ছিলেন সম্মেলনের প্রধান বক্তা, তিনিই সকলের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিলেন। দর্শকরা শুধু তাঁরই বক্তৃতা শুনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। আর বক্তৃতাও তিনি দিয়েছিলেন চমৎকার। গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর, বিশুদ্ধ বাগ্‌ভঙ্গী, যুক্তির সারবত্তা আর সিদ্ধান্তের সমীচীনতা—সবকিছু মিলিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা সকলকেই মুগ্ধ ও অভিভূত করে তুলেছিল। পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা আরো অনেকেই দিয়েছিলেন, কিন্তু আর কোনো বক্তাই এমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি, যেমন পেরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।"

চিকাগোর একখানা সংবাদপত্র লিখল: "বিশ্বধর্ম সম্মেলনে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন ভারতবর্ষ থেকে সমাগত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। কমলা লেবু রঙের আপাদবিলম্বিত আলখাল্লা, মাথার উপরে হলদে রঙের একটি পাগড়ি, দিব্যশ্রীমণ্ডিত মুখ, বিশাল অন্তর্ভেদী দুইটি চোখ, কেবলমাত্র এইজন্যই তিনি আকর্ষণের পাত্র হয়ে ওঠেন নি, তাঁর আশ্চর্য বক্তৃতাই আমেরিকাবাসীর চিত্ত জয় করেছে।"

"SWAMI VIVEKANANDA—THE HINDU MONK OF INDIA"

"ভারতের হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।"

এই নামটি আজ বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত আমেরিকায়। সেই মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছোট বড়ো সকল সহরে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর নাম। ধর্মপিপাসু বহু নর-নারী এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। নানা প্রতিষ্ঠান থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি নিমন্ত্রণের পর নিমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। সম্মেলনের শেষের অধিবেশনে খৃষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে তুমুল বিতর্ক উঠেছিল। পাদ্রীরা দাবী করলেন যে, পৃথিবীতে তাঁদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ—খৃষ্টান ধর্ম ই একমাত্র সত্যকার ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ এর প্রতিবাদ করলেন—প্রতিবাদ না করে তিনি থাকতে পারেন নি। আচার্যরূপে এইটাই ছিল সেদিন তাঁর প্রধান কাজ। আমেরিকার মতোন দেশে গোঁড়া পাদ্রীদের বিরুদ্ধাচারণ করা রীতিমত দুঃসাহসের কাজ ছিল সেদিন।

সম্মেলনের দ্বাদশদিনে এই তর্কটা উঠল। খৃষ্টান ধর্মযাজকগণ তাঁদের ধর্মের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। চীন, জাপান ও ভারতের প্রতিনিধিরা সবাই এই বিতর্কে যোগদান করলেন এবং

সবাই তীব্রভাবে খৃষ্টান পাদ্রীদের সমালোচনা করেন। সবশেষে উঠলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি যুক্তিজাল বিস্তার করে ভারতে পাদ্রীদের কার্যকলাপের প্রকৃত চিত্রটি শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরলেন। সেদিনকার বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: "খৃষ্টান পাদ্রীরা বহুকাল ধরেই ভারতবর্ষে এসে থাকেন। কিন্তু তাঁরা সেখানে করেন কি? অশিক্ষিতদের দেখান প্রাচুর্যের প্রলোভন। যদি কোনো হিন্দুসন্তান তার পিতা-পিতামহের ধর্মত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে, তাহোলে জীবনে তার আর কোন অভাব থাকবে না—মূর্খের মতোন পাদ্রীরা এইসব ভাঁওতা দিয়ে থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, এ কি ঠিক? যদি তোমরা সত্যই ভ্রাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ হোয়ে থাক, যদি তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের সন্তান যীশুখৃষ্টের প্রেম থাকে, তাহোলে স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর প্রতি সদয় ও সপ্রীতি ব্যবহার করতে শেখো। ভারতবর্ষের প্রয়োজন ধর্ম নয়—অর্থ। কেমন করে অর্থ উপার্জন করতে হয় তাই শেখাবার জন্য পাদ্রীদের ভারতে পাঠাও, ধর্মের কথা সেখানে প্রচার করবার দরকার নেই।"

গোঁড়া পাদ্রীরা স্বামিজীর এই কথায় খুব রেগে যায় ও তাঁরা তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকায় তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে তাদের মনে খুব ঈর্ষার সঞ্চার হোল। এমন কি, তারা তাঁর নির্মল চরিত্রের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কুৎসা রটনা করতে দ্বিধা করল না। কিন্তু সন্ন্যাসী এতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না; তিনি তাঁর কর্তব্যে অটল অচল রইলেন। ইতিমধ্যে অতলান্তিক মহাসাগর পার হয়ে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছল বিবেকানন্দের বিজয়-বার্তা। তাঁর স্বদেশবাসীর বিস্ময় ও আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না। আজ তাঁদের বিশ্বাস হোল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বৃথা তাঁর এই মানস-সন্তানকে বীর যোদ্ধারূপে চিহ্নিত করে দিয়ে বলেন নি যে, "নরেন একদিন দুনিয়াটাকে দু'হাতে নাড়া দেবে।"

চিকাগোর ধর্ম মহাসভায় তারই প্রথম আভাস দেখা গেল। সেখানে তাঁর অপূর্ব সাফল্যের মধ্যে যেন ভারতের নবযুগের আগমনী ঝংকৃত হোল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঠিক এমন ব্যাপার এর আগে আর কখনো ঘটেনি। পরেও না। চিকাগোতে বিবেকানন্দের বিজয় সমস্ত পৃথিবীর সামনে যেন ভারতবাসীর বিজয় বলে প্রতিভাত হোল। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত ভারতবাসী এই অপরিচিত বীর সন্ন্যাসীর আমেরিকা বিজয়ের বিবরণ কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে শুনল। তাঁর জন্মভূমি কলিকাতা মহানগরীর শিক্ষিতদের মধ্যেও উৎসাহ ও আনন্দ দেখা গেল। টাউন হলে এক বিরাট সভা বসল। সেই সভায় শহরের খ্যাতমামা পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র সভা একবাক্যে হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁর কাজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে একটি প্রস্তাব তুললেন। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রস্তাবটি সমর্থিত হয়। সেই প্রস্তাবের একটি নকল স্বামিজীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেটি পেয়ে তিনি লিখেছিলেন: "কলিকাতা টাউন হলের জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবটি আমি পেয়েছি। আমার জন্মভূমির অধিবাসিদের সদয় বাক্যে এবং আমার সামান্য কাজের সহৃদয় অনুমোদনের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি তাঁর গুরুভাইরা তাঁদের নেতার এই বিজয় গৌরবে যারপর নাই গৌরব বোধ করলেন।

'যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে—আমেরিকায় গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ কি করেছিলেন? এর উত্তরে আমি অমনি বলব— বিশ্বধর্ম সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রাচীন হিন্দুধর্মের তিনি যে নতুন ব্যাখ্যা করেছিলেন তাই হিন্দুধর্মকে সর্বপ্রথম একটা সর্বজনীন গৌরব

দিয়েছিল। স্বদেশের ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক গৌরব বৃদ্ধি করবার আকাঙ্খা তাঁর অন্তরে ছিল; তাই না তিনি বেদান্তের উদার বাণী পাশ্চাত্য জগতে নতুন করে প্রচার করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করে দিয়েছিলেন। যে কাজের সূচনামাত্র করেন রাজা রামমোহন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যে কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন, এযুগে রবীন্দ্রনাথ, আর স্বামী বিবেকানন্দ তাই করে গেছেন।

ধর্মমহাসভার অধিবেশন শেষ হয়ে গেল।

এর পর প্রায় এক বছর পর্যন্ত আচার্য বিবেকানন্দ যুক্তরাজ্যের নগর নগরে অসংখ্য বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন। এর মধ্যে ডেট্রয়েট শহরে ইউনিটেরিয়ান গির্জায় ধারাবাহিকরূপে তিনি কতকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর চার মাস ধরে তিনি অক্লান্তভাবে চিকাগো, নিউইয়র্ক ও বোষ্টনের চারপাশের ছোট-বড় শহরগুলিতে বক্তৃতা দিতে থাকেন। প্রথম প্রথম তিনি এক বক্তৃতা প্রযোজক কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিছেন। তারাই বক্তৃতার স্থান ও সময় ঠিক করে দিত আর তিনি ঠিক করে দিতেন তাঁর বক্তৃতার বিষয়। এর ফলে তিনি যুক্তরাজ্যের শহরে শহরে বক্তৃতা করে বহু অর্থ রোজগার করেছিলেন। এর থেকে কিছু টাকা তিনি বরানগরের সুপ্রসিদ্ধ সমাজ সেবাব্রতী শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠিয়েছিলেন আর বাকী টাকা তাঁর গুরুভাইদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এক-একটা বক্তৃতায় তিনি কুড়ি থেকে আশি ডলার পর্যন্ত পেতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশি দিন চলে নি। এর পর তিনি আর চুক্তিবদ্ধভাবে বক্তৃতা দিতেন না, স্বাধীনভাবেই বক্তৃতা করতেন।

শুধু বক্তৃতা দিয়ে বিবেকানন্দ নিরস্ত ছিলেন না। তিনি কয়েকজন উদ্যোগী ও অনুরাগী শিষ্যদের নিয়ে জ্ঞানযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত ক্লাস খুলে দিলেন। নিউ ইংলণ্ডের

অন্যাপাতা 'গ্রীন একারে' কয়েকজন ছাত্র বেদান্তদর্শন শিক্ষা করবার জন্য এলেন তাঁর কাছে। তিনি আগ্রহের সঙ্গে তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। এই সব ছাত্ররা তাঁদের আচার্যের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য গাছের তলায় গ্রামীন ভারতীয় রীতির অনুসরণ করে মাটির ওপরে স্বামিজীকে ঘিরে উপবেশন করতেন। তারপর ব্রুকলিন শহরের একটি নৈতিক সভায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন। তাঁর প্রত্যেক বক্তৃতাতেই হাজাব হাজার শ্রোতার সমাগম হতো। সকলেই সাগ্রহে শুনতো তাঁর বক্তৃতা ও উপদেশ। ইতিমধ্যে অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁব প্রচারকার্যে সহায়তা কবেছিলেন। এঁদের মধ্যে মাদাম মেরি লুই, ডাক্তার স্যাণ্ডসবার্গ, মিসেস ওলিবুল, ডাক্তার য়্যালেন, মিস ওয়াল্ডো, অধ্যাপক ওয়েমান ও রাইট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পরে এঁদের কেউ কেউ ভারতবর্ষে এসেছিলেন। নিউইয়র্কের ধনী সমাজের মিঃ ও মিসেস ফ্রান্সিস লেগেট ও মিস জে. ম্যাকলিয়ডও স্বামিজীব শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর প্রচারকার্যে সহায়তা করেছিলেন। সুবিখ্যাত গায়িকা মাদাম কালভে পর্যন্ত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

অশ্রান্তভাবে দিনের পর দিন কাজ করে চলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। বক্তৃতা দেওয়া, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা আর জ্ঞানন্বেষী শিষ্যদের নিয়ে শাস্ত্রীয় বিষয় আলোচনা ইত্যাদি কাজের যেন বিরাম নেই। পাশ্চাত্যের জীবনধারা খুঁটিয়ে দেখা আর অনেক ধর্মানুরাগিদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হওয়া —এই সব বিবিধ কাজের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয় সন্ন্যাসীর দিনগুলি। কিন্তু এতসব কাজের মধ্যে থেকেও তিনি একদিনের জন্যও তাঁর স্বদেশকে বিস্মৃত হতে পারেন নি। চারদিকে প্রাচুর্য আর আরামের পরিবেশ। চারদিকে বিলাসের সহস্র উপকরণ।

চারদিকে ভোগের সমারোহ। যখন যে বাড়িতে অতিথি হয়ে বাস করেন, তখনই দেখেন যে তাঁর শয়নের জন্য দুধের ফেনার মত শাদা নরম বিছানা তৈরি রয়েছে। যখনই সেই আরামদায়ক বিছানায় তিনি শুয়েছেন অমনি বিবেকানন্দ তাঁর শরীরে বোধ করেছেন হাজার বিছের কামড়। তাঁর এই সময়কার মনের ভাব প্রকাশ করে এক চিঠিতে স্বামিজী লিখেছিলেন : "আমি এই আরামের মধ্যে রয়েছি। আর আমার নিরন্ন নিপীড়িত দেশের লক্ষ ভাই-বোনের দু'মুঠো অন্ন জোটে না! আকাশের নীচে তারা আশ্রয় খোঁজে। এই আরামের শয্যা আমার নয়।"

বিবেকানন্দের বিশ্রাম নেই।

শ্রীচৈতন্য এবং শঙ্করাচার্যের ধর্মপ্রচার অভিযানের কাহিনী আমরা ইতিহাসে পড়েছি। তাঁদের সেই প্রচার-ব্রতের সঙ্গে আমেরিকায় বিবেকানন্দের এই প্রচার-ব্রতের তুলনা করা যেতে পারে। সাধারণ সভায় বক্তৃতা, কখনো বা কোনো বিশিষ্ট লোকের বাড়িতে বৈঠকী আলোচনা—এইভাবে চলে তাঁর অশ্রান্ত প্রচার অভিযান। এইভাবে এক বছরের মধ্যে তিনি অতলান্তিক উপকূল থেকে মিসিসিপি নদীর তীর পর্যন্ত সকল প্রদেশের প্রধান প্রধান শহরে ঘুরে বেড়ালেন। এই হিন্দু সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে যেন এক নবজীবনের তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠল এখানকার নর-নারীদের হৃদয়ের। অদ্বৈতবেদান্তের উদার বাণীর মধ্যে তারা খুঁজে পায় এক নতুন জীবন দর্শন। প্রাচীন ভারতবর্ষ আজ তার বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের মহিমা নিয়ে এক নতুনরূপে তাদের চেতনায় যেন ফুটে উঠল। ধন-গর্বিত মার্কিন সভ্যতা উপলব্ধি করল ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব। সন্ন্যাসীকে উপলক্ষ করে ভারতবর্ষের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলো পাশ্চাত্য মহাদেশ।

যুক্তরাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ও শিল্পকেন্দ্র ডেট্রয়েট শহর। আবার এখানকার প্রাচীনতম শহরগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। এই শহরে তিনি দুবার এসে বক্তৃতা দিয়ে এখানকার অধিবাসীদের মনে এক তুমুল আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিলেন। এখানে আবার পাদ্রীদের ছিল বিলক্ষণ প্রভাব। তারা এখানে তাঁর বিরুদ্ধে খুব উঠে-পড়ে লেগেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা হার মানতে বাধ্য হয়। ডেট্রয়েট শহরে তাঁর যোদ্ধমূর্তি দেখে পাদ্রীরা রীতিমত শঙ্কিত হয়।

১৮৯৫।

বিবেকানন্দ এখন থেকে নিউইয়র্ক শহরকেই তাঁর কর্মের প্রধান কেন্দ্র করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজের ধারাও বদললেন। এখানে ওখানে যাওয়া কিম্বা বৈঠকী আলাপ আলোচনা ইত্যাদি সব বন্ধ করে দিলেন। এখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, এবার দরকার কয়েকজন সত্যনিষ্ঠ আর উৎসাহী ছাত্র। তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তৈরি করতে পারলেই তাঁর আমেরিকায় আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। সেই কাজেই তিনি এইবার বিশেষভাবে মন ঢেলে দিলেন। নিউইয়র্কে লেকচার-ক্লাস খুলে তিনি বিনামূল্যে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। যুক্তরাজ্যে আজ যে রামকৃষ্ণ মিশনের পতাকা উড়েছে তার সূচনা সেদিন এইভাবেই হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দই সেদিন সেখানে তার বীজ বপন করে এসেছিলেন।

নিউইয়র্কে স্বামিজী ক্লাস খুললেন।

বেদান্ত প্রচার শুরু হয়ে গেল প্রবল উদ্যমে।

এই ক্লাসে প্রধানতঃ রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ শিক্ষা দেওয়া হোত।

"ধর্ম্ম একটা বিশ্বাসমাত্র নয়, সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয়। এ লাভ করতে হোলে শরীর ও মনের সংযম-বিষয়ক কতকগুলি

নিয়ম প্রত্যহ অভ্যাস করা দরকার। এরই নাম রাজযোগ। রাজযোগে ধ্যানই প্রধান। গুরুর কাছে এই ধ্যানের নিয়ম শিখতে হয়।"—এইভাবে আচার্য বিবেকানন্দ তাঁর মার্কিন শিষ্য-শিষ্যাদের শিক্ষা দিতেন। সে শিক্ষা তাদের হৃদয়ে গেঁথে যেত।

উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না তিনি। নিজে ধ্যানের কৌশল দেখিয়ে দিতেন। তখন তাঁর সেই ধ্যানমগ্ন মূর্তিখানি দেখে সকলের মন শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে অবনত হোত তাঁর চরণে। এইভাবে ১৮৯৫ সালের শুরু থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি অমানুষিক পরিশ্রম সহকারে যুক্তরাজ্যে বেদান্ত ধর্ম প্রচার করে হাজার হাজার মার্কিন ভক্ত ও অনুরাগী শিষ্য লাভ করলেন। তাঁর 'রাজযোগ' বইখানি এইসময়ে আমেরিকায় প্রথম মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

সহস্র দ্বীপোদ্যান।

সেন্ট লরেন্স নদীর মাঝখানে এই রমণীয় স্থানটিতে কিছুকাল এসে বাস করলেন স্বামিজী। এই জায়গাটি ছিল তাঁরই এক সম্ভ্রান্ত মার্কিন শিষ্যের। অতি নির্জন ও মনোরম স্থান। পাহাড়ের ওপর যেদিকে তাকাও—মাথার ওপর কেবল নীল আকাশ আর নীচে নদীর অফুরন্ত জলরাশি। স্বামিজী প্রায় দু'মাস কাল এখানে বাস করলেন। মাসের পর মাস নগরের কোলাহল ও মানুষের ভীড়ের মধ্যে অজস্র কাজের চাপে তাঁর শরীর ও মন এই সময়ে ক্লান্তিতে ভরে গিয়েছিল। একটু বিশ্রামের জন্য মন তাঁর উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। এই নির্জন সহস্র দ্বীপোদ্যানে এসে প্রকৃতির শান্ত পরিবেশের মধ্যে কিছুদিন বাস করে তাঁর মন আবার সতেজ হয়ে ওঠে। এইখানেই একদিন তিনি তাঁর বিখ্যাত কবিতা, 'সন্ন্যাসীর গীতি' রচনা করেন। সেই কবিতাটির কয়েকটি লাইনের বাংলা অনুবাদ এখানে তুলে দিলাম। যেমন উদাত্ত আর তেমনি ঝঙ্কারময় এই বাণী। সন্ন্যাসী বলছেন :—

উঠাও সন্ন্যাসি, উঠাও সে তান
হিমাদ্রি-শিখরে উঠিল যে গান—
গভীর অরণ্যে, পর্বত-প্রদেশে,
সংসারের তাপ যথা নাহি পশে—
সে সঙ্গীত-ধ্বনি প্রশান্ত লহরী
সংসারের রোল উঠে ভেদ করি ;
কাঞ্চন কি কাম কিংবা যশ-আশ,
যাইতে না পারে কভু যার পাশ,
যথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-ত্রিবেণী
সাধু যায় স্নান করে ধন্য মানি—
উঠাও সন্ন্যাসী, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও, গাও সেই গান
ওঁ তৎসৎ ওঁ

১৮৯৫ সালের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্ক ত্যাগ করে বেদান্ত প্রচারের জন্য এলেন ইংলণ্ডে। তাঁর লণ্ডনে বেদান্ত প্রচারের কথা পরে বলছি। লণ্ডনে তিন মাস থেকে তিনি ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে আবার আমেরিকায় ফিরে আসেন। এইবার তাঁকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এইখানে ১৮৯৬ সালের ২৫শে মার্চ তিনি 'বেদান্তদর্শন' সম্বন্ধে একটি চমৎকার বক্তৃতা করেন বিদগ্ধমণ্ডলীর সামনে। সেই সারগর্ভ বক্তৃতা শুনে সকলেই তাঁর পাণ্ডিত্যে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়বার যুক্তরাজ্যে এসে তিনি প্রায় পাঁচ মাসকাল ছিলেন এবং তারপর আবার য়ুরোপে ফিরে যান। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি যুক্তরাজ্যে এসেছিলেন, প্রায় আড়াই বছরকাল প্রচারের ফলে তা কিছুটা সফল

হয়েছে। এইবার লণ্ডনকে কেন্দ্র করে তিনি য়ুরোপ মহাদেশে বেদান্তের বাণী প্রচার করতে মনস্থ করলেন।

প্রথমবার লণ্ডনে এসে তিনি তিন মাসের বেশি থাকতে পারেন নি। প্যারিস হোয়ে তিনি লণ্ডনে পোঁছলেন। য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র লণ্ডন। ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন। সেই ইংরেজের খাস রাজধানী লণ্ডনে তিনি তাই একটু সংকোচের সঙ্গেই প্রবেশ করেছিলেন। সেই সঙ্গে একটু বিরূপ মনোভাব যে ছিল না, তা নয়। কিন্তু দেখা গেল যে, পরাধীন জাতির একজন ধর্মপ্রচারককে লণ্ডন যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বাগতম জানাল। ইংরেজ শাসকজাতি ; স্বামিজী স্বদেশভিমানী। তাই তাঁর মনে ইংরেজদের সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব যে ছিল না তা বলা শক্ত। কিন্তু স্বামিজী নিজেই বলেছেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই ইংরেজদের সম্পর্কে তাঁর আগেকার ধারণা দূর হয়। ইংলণ্ডের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ সকল শ্রেণীর ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশা করে, তাদের চরিত্রের মহত্ত্ব আবিষ্কার করে তিনি যারপর নাই মুগ্ধ হলেন। তাই আমেরিকার চেয়ে ইংলণ্ডেই তাঁকে বেশি করে আকৃষ্ট করল।

লণ্ডনেও তরঙ্গ তুললেন স্বামী বিবেকানন্দ। দেবদূতের মতন সুন্দর সৌম্য উজ্জ্বলমূর্তি এই নবীন সন্ন্যাসীর কণ্ঠে অদ্বৈতবেদান্তের উদার বাণী শুনে লণ্ডনের বিদগ্ধসমাজ বিস্মিত হয়। তাঁর যশোগানে পরিপূর্ণ হয় ইংলণ্ডের আকাশ-বাতাস। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে 'হিন্দুযোগীর নাম'। দলে দলে লোক আসে তাঁকে দেখতে। তাঁর বক্তৃতা শুনতে তাদের আগ্রহের যেন সীমা নেই। সকলেই মুগ্ধ হয় তাঁর বক্তৃতা আর ধর্মোপদেশ শুনে। পিকাডিলির প্রিন্সেস হলে প্রথম যেদিন বিবেকানন্দ বক্তৃতা করলেন, সেই বক্তৃতার বিবরণ পরের দিন সমস্ত কাগজে ভালভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

তিনি এতটা আশা করেন নি। হাজার হাজার শ্রোতার সামনে 'আত্মজ্ঞান' সম্পর্কে তাঁর আর একটি বক্তৃতা সকলকে মুগ্ধ করলো। রাজা রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের পর এমন শক্তিশালী ভারতীয় ইংলণ্ডের বক্তৃতামঞ্চে আর কখনো অবতীর্ণ হন নি। সমস্ত খবরের কাগজে তাঁর সেই বক্তৃতার প্রশংসামূলক সংবাদ বেরুল। একমাস কালের মধ্যেই লণ্ডনে তিনি বিপুল প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। এই সময়ে একটি বক্তৃতাসভায় একজন বিদুষী আইরিশ মহিলা—মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল—স্বামিজীর সঙ্গে পরিচিতা হন। পরবর্তীকালে ইনিই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে 'ভগিনী নিবেদিতা' এই নামে ভারতবাসীর কাছে পরিচিতা হয়েছিলেন। এঁর কথা পরে বলব।

একদিন লণ্ডনে এক সভায় একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "স্বামিজী, আপনি তো হিন্দুসন্ন্যাসী, আপনি যীশুখৃষ্ট বা খৃষ্টানধর্ম সম্পর্কে যখন বলেন তখন তা আপনার পক্ষে অনধিকারচর্চা হয় না কি?" এর উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ "মহামানব যীশু প্রাচ্যদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন; আমিও প্রাচ্যদেশের সন্ন্যাসী। আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য জগৎ এখনো যীশুকে চিনতে পারে নি, তাঁর প্রচারিত ধর্ম ঠিক মত বুঝতে পারেনি। যীশু কি বলেন নি—'যাও তোমার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে এসো, তারপর আমার অনুসরণ কর'?" এই কথা শুনে প্রশ্নকর্তা নীরব হন। এই রকম আরো অনেক ঘটনা থেকে জানতে পারা যায় যে ইংলণ্ডে স্বামিজীর প্রচার কাজ খুব সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছিল।

দ্বিতীয়বার লণ্ডনে এসে স্বামী বিবেকানন্দ অক্সফোর্ডে গিয়ে পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিছুদিন আগে ম্যাক্সমুলার রামকৃষ্ণ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন; স্বামিজী

সেটি পাঠ করা অবধি তিনি অক্সফোর্ডের এই বিখ্যাত মনীষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ব্যগ্র হন।

—আপনার পাণ্ডিত্যের কথা আর ভারত-প্রীতির কথা শুনে অবধি আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি ব্যগ্র হয়েছি, বললেন বিবেকানন্দ।

—আপনার গুরুদেবের কথা যতই আমি আলোচনা করছি ততই তাঁর প্রতি আমার মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছে, বললেন ম্যাক্সমুলার।

তখন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে রামকৃষ্ণের পবিত্র উপদেশাবলী শোনালেন।

—আমার খুব ইচ্ছা যে আমি তাঁর সম্পর্কে একখানা জীবন-চরিত লিখি।

—বেশ তো। আমি আপনাকে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে দেব।

এর কিছুকাল পরেই অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ' এই নাম দিয়ে একখানি বই লেখেন। যথাসময়ে প্রকাশিত হোল বইখানি। এর দ্বারা য়ুরোপে তাঁর প্রচারকাজের অনেক সুবিধা হয়েছিল। সেদিন এই একখানি বইয়ের ভেতর দিয়ে য়ুরোপ ভারতের আধ্যাত্মিক মহিমার স্বরূপ অনেকখানি বুঝতে পেয়েছিল।

এরপর তিনি জেনেভা, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, ইতালি প্রভৃতি দেশগুলি ভ্রমণ করেন। সর্বত্র তিনি বিপুলভবে সম্বর্ধিত হন। সর্বত্রই তাঁর বক্তৃতা আর উপদেশ শুনে সকলে মুগ্ধ হয়। য়ুরোপের লোক স্বামিজীর নাম দিয়েছিল 'সাইক্লোন সাধু'। সত্যি, ঝড়ের গতিতে তিনি অবিরাম ছুটে চলতেন যেন। একটা প্রচণ্ড কর্মের আধার ছিলেন তিনি। জার্মানীতে এসে তিনি বৈদান্তিক পণ্ডিত পল

ডয়সনের সঙ্গে মিলিত হন ও তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে খুশি হন। এইভাবে আমেরিকা ও য়ুরোপে প্রায় চার বছর ধরে বেদান্তের বাণী ও তাঁর ইষ্টদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 'যত মত পথ— সর্বধর্ম সমন্বয়ের এই বাণী প্রচার করে, ১৮৯৬ সালের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ যশের মুকুট মাথায় পরে ভারতবর্ষে ফিরলেন। ভারতমাতা তাঁর বিজয়ী সন্তানকে কোলে তুলে নিলেন।

"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"

চার বছরের অক্লান্ত ভ্রমণ শেষ করে, জন্মভূমিতে পদার্পণ করে স্বামিজীর প্রথম বাণী হোল—"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" আমরাই এবার জগতে শিক্ষাগুরুর স্থান নেব।"

স্বামিজী স্বদেশে ফিরে আসছেন।

ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচারিত হোল এই শুভ সংবাদ।

সর্বত্র তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আয়োজন হয়। সর্বপ্রথম তিনি সিংহলে অভ্যর্থিত হলেন। সিংহলের রাজধানী কলম্বো শহরে এক বিপুল উৎসাহ দেখা দিল যেদিন তিনি জাহাজ থেকে সেখানে অবতরণ করলেন। সেখানকার হিন্দুসমাজ তাঁকে জানায় সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। সমুদ্রতীরে সমবেত বিপুল জনসংঘের হর্ষোচ্ছল-কণ্ঠে উঠল সন্ন্যাসীর জয়ধ্বনি। সেখান থেকে গাড়ি করে তিনি নগরে প্রবেশ করলেন—তাঁর পেছনে ও সামনে সিংহলী নরনারীর শোভাযাত্রা। রাজপথের স্থানে স্থানে তাঁর সম্মানে তৈরি হয়েছে কত তোরণ, তোরণ-শীর্ষে কত পতাকা। ফুলের মালা আর লতায় পাতায় শোভিত দারুচিনি উদ্যানের সামনে একটি বিরাট মণ্ডপ। সেইখানে স্বামিজীকে অভিনন্দন দেওয়া হোল। চার বছর আগে যখন তিনি ভারতবর্ষ থেকে পাশ্চাত্য জগতে ধর্মপ্রচারে

গিয়েছিলেন, সেদিন তিনি ছিলেন একজন অখ্যাত এবং অজ্ঞাত পরিব্রাজক সন্ন্যাসী মাত্র—আর আজ তিনি বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী। তাঁর যশোগানে আজ দিগ্‌বিদিক মুখরিত। সেদিনের সেই কপর্দক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আজ ভারত সমুদ্রতীরে সিংহলের রাজধানীতে রাজার মতন সম্মানে অভ্যর্থিত হলেন।

পাঁচ দিন পরে সিংহল থেকে একটি ষ্টীমারে করে স্বামিজী ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করলেন। সঙ্গে কয়েকজন শিষ্য আর গুরুভাই স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। রামনাদে নামলেন তিনি। বিপুল জনসঙ্ঘ সমুদ্রতীরে উদ্‌গ্রীব হোয়ে তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছিল; তাদের পুরোভাগে ছিলেন রামনাদের রাজা ভাস্করবর্মা স্বয়ং। ইনি স্বামিজীর একজন অনুরাগী শিষ্য। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। পশ্চিম আকাশে আবীরের গুঁড়ো। সেই বিচিত্র পরিবেশে স্বদেশের মৃত্তিকায় পদার্পণ করলেন স্বামিজী। হাজার হাজার লোক তাঁকে জানায় প্রণতি। এমন মহিমময় দৃশ্য ভারতের ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায়নি। সমুদ্রতীরে সুন্দর চাঁদোয়া-খাটানো একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হয় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষ থেকে একখানি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয় তাঁকে। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় একটি বক্তৃতা করলেন।

পরের দিন স্বামিজী রামেশ্বরের মন্দির দর্শন করতে গেলেন। মনে পড়ল, পাঁচ বছর আগে এইখানে তিনি তাঁর পরিব্রাজক-ব্রত উদ্‌যাপিত করেছিলেন। তখন তিনি অপরিচিত সন্ন্যাসী মাত্র। এইখানে মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন—যত্র জীব তত্র শিব। এই মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রত্যেক নরনারীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করাই প্রকৃত শিবভক্তি।

এরপর মদুরা, ত্রিচিনোপল্লী, তাঞ্জোর ও কুম্ভকোণম প্রভৃতি শহর হোয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এলেন মাদ্রাজে। প্রথমে তিনি

মাদ্রাজবাসীর নিকট যে বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করেন তার স্মৃতি তাঁর জীবনে চিরদিন জাগ্রত ছিল। এই উপলক্ষে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছিল। তাঁর একখানি জীবনীগ্রন্থে এই অভ্যর্থনার বর্ণনা এইরকম দেওয়া হয়েছেঃ "প্রতি সৌধচূড়ায় দ্বিরঞ্জিত পতাকাবলী, সুবৃহৎ তোরণমালায় পরিশোভিত রাজপথ-সমূহ—সমগ্র মাদ্রাজ নগরী অপূর্ব শোভায় সজ্জিত হইয়া স্বামিজীকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য উন্মুখ আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ...পথিমধ্যে তাঁহার শিরে অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দলে দলে নরনারী নারিকেল ইত্যাদি বিবিধ ফল তাঁহাকে শ্রদ্ধা-সহকারে উপহার প্রদান করিতে লাগিল। কোন কোন পুরনারী প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়াইয়া স্বামিজীকে পঞ্চপ্রদীপ দিয়া আরতি করিতে লাগিলেন এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পুষ্পচন্দনে অর্ঘ্যদান করিতে লাগিলেন।"

একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে সহস্র সহস্র জনতার সম্মুখে স্বামিজীকে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হোল। খেতড়ির মহারাজা একখানা অভিনন্দনপত্র পাঠিয়েছিলেন, প্রথমে সেইখানি পাঠ করা হয়। তারপর বিভিন্ন সম্প্রদায়, সভা ও সমিতির পক্ষ থেকে সংস্কৃত, ইংরেজি, তামিল, তেলেগু, প্রভৃতি ভাষায় প্রায় কুড়িখানা অভিনন্দনপত্র পঠিত হয়। দশ হাজারের বেশি লোক উপস্থিত ছিল সেই অভ্যর্থনা সভায়। মাদ্রাজে তিনি নয় দিন ছিলেন, এই নয় দিন যেন মাদ্রাজের নরনারীর জীবনে নবরাত্রির উৎসব এনে দিয়েছিল। এই নয় দিনে স্বামিজী নানা বিষয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা করেন। কলম্বো থেকে মাদ্রাজ—এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করবার সময় তিনি যে সব বক্তৃতা করেন তার মধ্যে নতুন চিন্তা, নতুন ভাব আর নতুন কর্মপদ্ধতির পরিচয় পেয়ে সকলেই বুঝলেন যে, নবযুগের সূচনা করবার মতোন অনুপম

প্রতিভা ও অসামান্য হৃদয় নিয়েই এই সন্ন্যাসী স্বদেশের কর্মক্ষেত্রে ফিরে এসেছেন। পুণা থেকে জননায়ক লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক স্বামী বিবেকানন্দকে একবার পুণা যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু কলম্বো থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত অবিশ্রান্ত বক্তৃতা, কথোপকথন, দেখাসাক্ষাৎ ইত্যাদিতে তিনি তখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মাদ্রাজ থেকে স্বামিজী কলিকাতায় এলেন জলপথে।

খিদিরপুরের জাহাজঘাটে অবতরণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেখান থেকে ট্রেণযোগে তিনি এলেন কলিকাতায় শিয়ালদহ ষ্টেশনে।

"জয় বিবেকানন্দ স্বামিজী কি জয়।"

সহস্র জনতার কণ্ঠে ওঠে বিপুল জয়ধ্বনি।

তখন সবেমাত্র সকাল হয়েছে যখন স্বামিজী ট্রেন থেকে নেমে সহাস্যমুখে সমবেত জনতাকে যুক্তকরে প্রণাম করলেন। শিয়ালদহের কাছেই রিপণ কলেজ (এখনকার নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ)। সেইখানে উপস্থিত সকলকে শিষ্টালাপে পরিতৃপ্ত করে স্বামিজী বিদায় নিলেন। দুপুরবেলায় বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়িতে বিশ্রাম করে বিকাল বেলায় তিনি সদলবলে কাশীপুরের গোপাল শীলের বাগান-বাড়িতে এলেন। সঙ্গে কয়েকজন পাশ্চাত্য শিষ্য ও শিষ্যা ছিলেন; তাঁদের সকলের থাকবার ব্যবস্থা এখানে হয়েছিল। রাত্রিবেলায় তিনি গেলেন আলমবাজার মঠে—মিলিত হন গুরুভাইদের সঙ্গে। ভবিষ্যতে কি ভাবে কাজ করবেন, তাই নিয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

এক সপ্তাহ পরের কথা।

কলিকাতাবাসীর পক্ষ থেকে শোভাবাজারের রাজবাড়ির সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দকে অভ্যর্থনা জানানো হোল। 'ইণ্ডিয়ান

মিরার' পত্রিকায় এই অভ্যর্থনা সম্পর্কে এই রকম একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। "বিশিষ্ট নাগরিকগণ, পণ্ডিতগণ, বিশিষ্ট ইংরেজগণ, কলেজের ছাত্রবৃন্দ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সভায় উপস্থিত হইলেন। প্রায় পাঁচ হাজার ব্যক্তি সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ সভায় প্রবেশ করিবামাত্র সমবেত জনতা সম্ভ্রমভরে উঠিয়া জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিল। সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর রৌপ্যাধারে অভিনন্দনপত্র স্বামিজীর হস্তে অর্পণ করিলেন এবং অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন।"

দিগ্বিজয়ীর গৌরব নিয়ে স্বামিজী ফিরলেন ভারতবর্ষে।

"আমি কত বিদেশ ঘুরে এলাম, কিন্তু স্বদেশের ধূলিকণা আমার কাছে সবচেয়ে পবিত্র, ভারত আমার চিরজন্মের তীর্থ।" এই কথা বললেন বিবেকানন্দ একদিনের একটি সম্বর্ধনা সভায়।

বিপুল সাড়া জাগে এদেশের লোকের মনে। তাঁর সাগরপারের জয়যাত্রার ইতিহাস ভারতবাসীর মনেপ্রাণে আজ এনে দিয়েছে মুক্তির আস্বাদ। তিনি যেন মৃতকল্প এই জাতির প্রাণে আজ জাগিয়ে তুলেছেন নতুন আশা, নতুন ভরসা। নবীন ভারত তাই স্বাগত জানায় যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দকে। কলম্বো থেকে কলিকাতা মুখরিত হয় সন্ন্যাসীর জয়ধ্বনিতে। কলিকাতার সম্বর্ধনা সভায় দেশের যুবকদের উদ্দেশ করে তিনি বললেনঃ "আমি তোমাদের কাছে এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য আমার অন্তরের সহানুভূতি, আমার সকল প্রয়াস দায়স্বরূপ অর্পণ করছি। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থ-সারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলে দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি তাঁর বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে এক রাজনটীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাকে উদ্ধার করেছিলেন। যাও, তাঁর কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হও আর তাঁর কাছে এক মহাবলি প্রদান কর—জীবনবলি,

তাদের জন্যে, যাদের জন্যে তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, যাদের তিনি সবচেয়ে ভালবাসেন, সেই দীন, দরিদ্র, পতিত এবং উৎপীড়িতদের জন্যে। তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর, তাহোলেই বুঝব তোমরা আমাকে যথার্থ ভালবাস।"

মন্ত্রমুগ্ধ হোয়ে সবাই শুনল সন্ন্যাসীর কণ্ঠে এই অভিনব কথা।

ভগবান নয়, ঈশ্বর নয়, ধর্ম নয়, পরলোক নয়, এমনি কি পূজা-অর্চনা বা শাস্ত্রপাঠের কথাও তিনি বললেন না—বললেন শুধু ভারতের দরিদ্র, অস্পৃশ্য, নিপীড়িত আর বুভুক্ষু মানুষের কথা। বললেন--"দরিদ্র-নারায়ণের সেবার চেয়ে আর কোনো বড় ধর্ম নেই। তাদের উন্নতিই আমার দিনের চিন্তা, রাতের স্বপ্ন।"

আজ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি।

দক্ষিণেশ্বরেই উৎসব হবে।

সকালবেলাতেই পাশ্চাত্য শিষ্য ও শিষ্যাদের নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এলেন দক্ষিণেশ্বরে। এইখানেই একদিন এক মহা-পুরুষের পুণ্য স্পর্শে তাঁর জীবনের উদ্বোধন হয়েছিল, মনে পড়ল অতীতের সেই দিনগুলির কথা। দক্ষিণেশ্বরের প্রতিটি ধূলিকণা তাঁর কাছে আজ পবিত্র! উৎসবে বিপুল জনসমাগম হয়েছে। সবাই উৎসুক বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে দেখবার জন্য, তাঁর মুখের দু'টি কথা শুনবার জন্য। বক্তৃতা দিলেন তিনি। বললেন—"এ যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংস একটি মহান আদর্শ। তিনি একজন ধর্মবীর। যদি এই জাতি উঠতে চায়, তবে আমি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করছি, এই নামে সকলকে মাততে হবে। আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য, আমাদের পারমার্থিক উন্নতির জন্য এই মহান্ আদর্শকে আজ তোমাদের সামনে স্থাপন করছি।"

এই প্রথম প্রকাশ্যে শিষ্য তাঁর গুরুকে প্রচার করলেন।

রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী বিবেকানন্দের প্রতিভার আলোকে নতুন রূপ ধারণ করল। গুরুভাইদের তিনি বললেন: "ব্যক্তিগত ধ্যান তপস্যা বা মুক্তিলাভের চেষ্টা এখন থাক, এসো আমরা সবাই ঠাকুরের অভিপ্রায় সাধন করি—দেশে দেশে শিক্ষা-বিস্তার আর ধর্মপ্রচারের কাজে লেগে যাই। মন্দির ও প্রতিমার গণ্ডী থেকে ভগবানকে বাইরে এনে, 'যেখানে জীব, সেখানে শিব', এই মন্ত্রে বিরাটের পূজায় আমাদের অগ্রসর হোতে হবে। সেকালের মুনিঋষিদের মতোন নির্জন গিরিগুহায় বা কুটীরের মধ্যে চোখ বুঁজে তপস্যার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকলে কিছু হবে না। আমরা রামকৃষ্ণের সন্তান—এই সংসারের কর্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মানুষকে বড়ো কাজে প্রেরণা দেব আমরা, কোটি কোটি ভারতবাসীর অজ্ঞতা ও হৃদয়ের অন্ধকার দূর করব আমরা। ভারতের কল্যাণের জন্য এমন একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আমি গড়ে তুলব যারা মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে।"

অকাট্য এই যুক্তি।

চিত্তস্পন্দী এই আবেদন।

গুরুভাইয়েরা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন।

তাঁরা মেনে নিলেন তাঁদের নেতার কথা—যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দের নির্দেশ।

এর অল্পদিন পরেই বাংলার মাটিতে জন্ম নিলো রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। সেবাধর্মের পতাকা হাতে নিয়ে ভারতবাসীর সামনে দাঁড়ালেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভক্তি-মুক্তির কামনা ত্যাগ করে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় উৎসর্গ করলেন তাঁর জীবন। করুণার ছবি রঙে ও রেখায় ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো শতাব্দীর পটে।

এই সেবার আকুলতা কোথা থেকে এসেছিল সন্ন্যাসীর হৃদয়ে? নরেন্দ্রনাথ তখন নিয়মিতভাবে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া-আসা করেন। একদিন সবাই বসে আছেন। স্বামিজীও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা হচ্ছিল দয়া, পরোপকার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে। রামকৃষ্ণ ভাবমুখে সেদিন বলেছিলেনঃ "দয়া? কে কাঁকে দয়া করবে? দয়া নয়, দয়া নয়, সেবা—সেবা!" কথাটা নরেন্দ্রনাথের অন্তর স্পর্শ করেছিল। কিছুক্ষণ পরে বাইরে এসে তিনি বলেছিলনঃ "আজ ঠাকুর যা বল্লেন, তার মধ্যে যে কি নতুন আলো পেলাম! যদি বেঁচে থাকি, তা হোলে দেখাব।"

অনন্ত ভাবময় ঠাকুরের সেই মহান্ বাণীকে আজ বাস্তব রূপ দেবার জন্য আহিতাগ্নিক পুরোহিতরূপে বিবেকানন্দ স্থাপন করলেন বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন।

নতুন উদ্যমে কাজ আরম্ভ হোল বিবেকানন্দের।

প্রথমেই ঠিক করলেন একটা মঠ করতে হবে। দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করতে গেলে একটা সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস দরকার। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন এইবার। সেইসঙ্গে তিনি প্রচারের সুবিধা হবে বলে ইংরেজি ও বাংলার দুখানা মাসিক পত্রিকা বের করবার আয়োজনও করলেন। ১৮৯৮ সালে ইংরেজি 'প্রবুদ্ধ ভারত' আর পরের বছর বাংলা 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হোল। এই 'উদ্বোধন'-কে কেন্দ্র করেই পরে গড়ে ওঠে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের পুস্তক প্রকাশনার কাজ।

১৮৯৮ সালে গঙ্গার তীরে বেলুড় মঠ স্থাপিত হয়।

নীলাম্বর মুখার্জির (ইনি কাশ্মীরের দেওয়ান ছিলেন) একটা বড়ো বাগানবাড়ি ছিল গঙ্গার ধারে। উনচল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে সেই বাইশ বিঘে জমিটা কেনা হয়। স্বামিজীর এক ধনী

মার্কিন শিষ্যা, মিস হেনরিয়েটা মুলার এই টাকাটা দিয়েছিলেন। এক বছরের মধ্যেই মঠের বাড়ি নির্মিত হয়। মঠ নির্মাণের টাকা দিয়েছিলেন মিসেস ওলে বুল। এইভাবে মিশন ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিবেকানন্দ ঠিক করলেন তাঁর গুরুর উদার ও সর্বজনীন আদর্শকে দেশ-বিদেশে প্রচার করতে হবে। গুরুভাইদের মধ্যে সবাই শিক্ষিত। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন বিশ-পঁচিশ। প্রত্যেকেই বিবেকানন্দকে নেতা বলে মানতেন। মঠ ও মিশনের সভাপতি যদিও স্বামিজী হলেন, তবু এর পরিচালনার ভার তিনি দিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপর। মঠ ও মিশন স্থাপন করবার পর স্বামিজী খুব বেশিদিন বেঁচে ছিলেন না, তাই এই দুটি প্রতিষ্ঠানের যথার্থ নির্মাতা ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ—রামকৃষ্ণ সংঘে যিনি 'রাখাল মহারাজ' নামে পরিচিত।

বিবেকানন্দের সেবা আর প্রচারব্রতকে সার্থক করবার জন্য তাঁর গুরুভাইরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। সারদানন্দ আর অভেদানন্দকে বেদান্ত প্রচারের জন্য তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকা পাঠালেন। সিংহলে পাঠালেন শিবানন্দকে আর মাদ্রাজে শশী মহারাজকে। এমনিভাবে স্থানে স্থানে তাদের তিনি প্রেরণ করলেন। সকলেই উদ্‌বুদ্ধ হয়েছেন স্বামিজীর আদর্শে। স্বামিজীর কর্মব্রতের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী স্বামী অখণ্ডানন্দকে তিনি সেবার কাজে নিয়োগ করেন। এইভাবে ভারতের মাটিতে জন্ম নিয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন। সেদিন যা ছিল ক্ষুদ্র, আজ তা শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে। যে নতুন কর্মের প্রবাহ সেদিন সেই ১৮৯৮ সালে স্বামিজী সৃষ্টি করেছিলেন এই 'মিশন'কে কেন্দ্র করে, আজো অক্ষুণ্ণ ধারায় তা চলেছে এবং চলবেও চিরকাল।

স্বামিজীর আহ্বানে যে কয়জন বিদেশিনী মহিলা এই সময়ে

ভারতবর্ষে এসে ভারতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলের কথা আগে বলেছি। ইনি এইদেশে 'ভগিনী নিবেদিতা' এই নামেই পরিচিতা। এ নাম তাঁর গুরু বিবেকানন্দ তাঁকে দিয়েছিলেন। এই ভারতসেবিকা ভারতের সেবায় নিজের জীবনকে যেভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তার ইতিহাস জানবার মতোন। আমেরিকা থেকে এলেন সিষ্টার ক্রিশ্চিয়ানা। এঁরা দুজনেই বেলুড়ে এসে বাস করেন।

নিবেদিতাকে বিবেকানন্দ তাঁর মনের মতন করে গড়ে তুলেছিলেন এবং তাঁর ওপর তিনি মেয়েদের শিক্ষার ভার দিয়েছিলেন। বাগবাজারে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় তিনিই স্থাপন করে গিয়েছেন। ১৮৯৮ সালের ২৫শে মার্চ বিবেকানন্দ মার্গারেট নোবলকে ব্রহ্মচারিণী ব্রতে দীক্ষিত করেন। সেদিন স্বামিজী তাঁকে বলেছিলেন: "যদি তোমাকে ভারতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হয়, তবে তোমাকে সম্পূর্ণ ভারতীয়ভাবে চলতে হবে; আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার সকল বিষয়ে হিন্দু-ভাবাপন্ন হতে হবে। নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণী হয়ে তোমাকে জীবনযাপন করতে হবে। তোমাকে এখন চিন্তায়, ভাবে, অভ্যাসে ও প্রয়োজনে সম্পূর্ণ হিন্দু হতে হবে। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য তোমাকে সর্বস্বুখে জলাঞ্জলি দিতে হবে। বলো, পারবে?"

অবিচলিত কণ্ঠে নিবেদিতা উত্তর দিলেন—"পারব।"

সেদিন থেকে বিবেকানন্দের ভারত-মন্ত্র নিবেদিতার জপের মন্ত্র হোল।

বেলুড়মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন।

স্বামী বিবেকানন্দের এই হোল প্রধান কর্মকীর্তি।

মঠ ও মিশন স্থাপিত হবার পর থেকে তাঁব কাজ খুব বেড়ে যায়। এতটুকু বিশ্রাম নেই। সেই গুরুভার পরিশ্রম তাঁর কর্মক্লান্ত দেহে বেশী দিন সহ্য হোল না। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে শিষ্য ও গুরুভাইরা শঙ্কিত হোলেন। চিকিৎসক এলেন। পরীক্ষা করে উপদেশ দিলেন, অসুখ এমন কিছু গুরুতর নয়, তবে বায়ু-পরিবর্তন আর বিশ্রাম দরকার। ঠিক হোল কলিকাতা ত্যাগ করে স্বামিজী কিছুদিনের জন্য আলমোড়া গিয়ে থাকবেন। তখন সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই কেন্দ্রটির নাম 'অদ্বৈত আশ্রম'। এখানে রামকৃষ্ণের চিত্র বা মূর্তিপূজা হয় না।

আলমোড়ার স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশে কিছুকাল বাস করবার ফলে স্বামিজীর স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হোল। আড়াই মাসকাল এখানে অতিবাহিত করে তিনি এলেন পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে। কাশ্মীরে তিনি তুষারতীর্থ অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শন করেন। তাঁর এই তীর্থভ্রমণের সঙ্গিনী ছিলেন তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতা। নিবেদিতা লিখেছেন : "বিশাল গুহার মধ্যে তুষারময় শিবলিঙ্গ

বিরাজমান। সূর্যের আলো সেখানে প্রবেশ করে না। এই তীর্থপথে গুরুর যে মূর্তি দেখলাম, তা আমি কখনো কল্পনাও করিনি। অসংখ্য তীর্থযাত্রীর মধ্যে তিনিও যেন একজন। সমস্ত শরীর ভস্মাবৃত, পরণে মাত্র একটি কৌপিন। মুখখানি ভক্তিভরে উজ্জ্বল। এই সময় তিনি মালাজপ করতেন, উপোস করতেন আর পাঁচটি নদীর বরফের মতো হিমশীতল জলে স্বচ্ছন্দে স্নান করতেন। সেখান থেকে আমরা এলাম ক্ষীরভবানী। ক্ষীরভবানী কাশ্মীরের আর একটা পবিত্র তীর্থস্থান। এটা আসলে একটা ঝর্ণা। এখানে জগন্মাতার পুজো হয়।"

তীর্থযাত্রা শেষ করে স্বামিজী ফিরলেন কলিকাতায়।

উনিশ শতকের শেষ বছর।

বিবেকানন্দ আবার পৃথিবী ভ্রমণে বের হোলেন।

সঙ্গে নিলেন নিবেদিতাকে।

যাবার আগে একদিন বেলুড় মঠে সমবেত ভক্ত ও শিশুদের উদ্দেশে তিনি বক্তৃতা দিলেন। বললেন—"বাবা, সব, তোরা মানুষ হ—এই আমি চাই। এর কিছুমাত্র সফল হোলে আমার জন্ম সার্থক হবে। ঠাকুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার জন্যে যত্নবান হও—জীবনে কর্মের ও বৈরাগ্যের সমাবেশ করো।"

১৮৯৯, জুন মাস। 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে চড়ে স্বামী বিবেকানন্দ চলেছেন য়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে। একদিন জাহাজে কথা প্রসঙ্গে তিনি নিবেদিতাকে বললেন—"যতই দিন যাচ্ছে, ততই আমি বুঝতে পারছি একমাত্র পৌরুষলাভই জীবনের সবচেয়ে বড়ো সাধনা। এই কথাই আমি পৃথিবীতে প্রচার করছি।"

—আচার্যদেব, আপনার জীবনের আদর্শ কি? নিবেদিতা প্রশ্ন করেন নম্রভাবে।

—মানুষ গড়াই আমার জীবনের ব্রত। আমার বিশ্বাস দেশে

সত্যিকার মানুষ তৈরি হোলে জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি দুইই সুনিশ্চিত।

—শিক্ষার অর্থ কি ?

—মনুষ্যত্বের উদ্বোধন।

লণ্ডনে পৌঁছবার কয়েকদিন পরেই আমেরিকা থেকে আহ্বান এলো। স্বামিজী চললেন আমেরিকায়। সঙ্গে আছেন নিবেদিতা। আচার্যদেবের সঙ্গে তাঁর এই সমুদ্রযাত্রার কথা তিনি এইভাবে লিখেছেন: "সমুদ্রবক্ষে সেই দশদিনের স্মৃতি ভুলবার নয়। রোজ সকালে গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা; আবার কোনো দিন উপনিষদের আবৃত্তি ও অনুবাদ শুনতাম তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে। একদিন তিনি ঈশোপনিষদ থেকে এই শ্লোকটা আবৃত্তি করে শোনালেন:

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্॥

(অনুবাদ: ভগবানের দ্বারা সমস্ত জগৎ আচ্ছাদন কর; তিনি আমাদের যা দিয়েছেন তাই ভোগ কর, আর সব ত্যাগ করে কেবল তাঁকে নিয়ে থাক।)

বললেন—"পৃথিবীর আর কোন ধর্মগ্রন্থ এমন উচ্চ ভাবের কথা বলতে পেরেছে?" সমুদ্র যেমন শান্ত ও স্থির, ঠিক তেমনি শান্ত ও স্থির, দেখতাম স্বামিজীকে এই সময়ে।"

আমেরিকায় পৌছলেন স্বামিজী।

এই কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি দেখলেন গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দের চেষ্টায় বেদান্ত প্রচারের কাজ বেশ এগিয়ে গেছে। খুব খুশি হলেন। এইবার তিনি শিষ্যদের সাহায্যে নিউইয়র্ক, ক্যালিফর্ণিয়া প্রভৃতি শহরে বেদান্ত প্রচারের কয়েকটি স্থায়ী কেন্দ্র খুললেন। মিললেন ভক্তদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে। ক্যালিফর্ণিয়ার

রাজধানী স্যান ফ্রানসিসকো, ওকল্যাণ্ড আর ভারতবর্ষে আলমোড়া এই তিনটি স্থানে স্বামিজী বেঁচে থাকতেই বেদান্ত প্রচারের জন্য তিনটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।

১৯০০ স্যল। জুলাই মাস।

স্বামিজী প্যারিস অভিমুখে যাত্রা করলেন।

এ বছর এখানে একটা বিরাট প্রদর্শনী হবে। সেই সঙ্গে ধর্ম, ইতিহাস এবং বিজ্ঞানসভার একটা আন্তর্জাতিক অধিবেশন। প্যারিস থেকে নিমন্ত্রণ এলো, ধর্মসভায় বক্তৃতা করবার জন্য। স্বামিজী এই সুযোগ ছাড়লেন না। য়ুরোপের পণ্ডিতদের অনেকের মধ্যেই তিনি লক্ষ্য করেছেন হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। এই ধর্মসভায় তিনি তাঁদের সেই ধারণার প্রতিবাদ করে একটি বক্তৃতা দিলেন। একেবারে হিন্দুধর্মের গোড়াকার ইতিহাসের কথা তিনি আলোচনা করেন ঐ বক্তৃতায়। তাঁর সেই বক্তৃতা সাদরে গৃহীত হয়। প্যারিসের এই স্মরণীয় আন্তর্জাতিক সভার বিজ্ঞান শাখায় বক্তৃতা করবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন এক তরুণ বাঙালি বৈজ্ঞানিক। তিনি জগদীশচন্দ্র বসু। জগদীশচন্দ্র বিবেকানন্দের চেয়ে বয়সে ছয় বছরের বড়ো ছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বামিজী এক পত্রে লিখেছেন ঃ

"আজ ২৩শে অক্টোবর। এ বছর প্যারিসে মহা প্রদর্শনী। নানা দেশ থেকে অনেক পণ্ডিতলোকের সমাগম হয়েছে। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এই প্যারিসে। সেই বহু গৌরবপূর্ণ পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্য থেকে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের জন্মভূমির নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ জে, সি. বোস। এক যুবা বাঙালি বৈদ্যুতিক, আজ নিজের

প্রতিভায় পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন সঞ্চার করলো। সমস্ত বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু।”

রাত আটটা। বেলুড় মঠ।

ঠাকুরের সন্ধ্যারতি তখন হয়ে গিয়েছে। মঠের লোকজন যে যার কাজে ব্যস্ত। সদর দরজায় তালা বন্ধ। নির্জন স্থান—তাই এরই মধ্যে চারদিক নিস্তব্ধ। সবেমাত্র খাওয়ার ঘণ্টা পড়েছে, এমন সময়ে মালী এসে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে খবর দেয়—“একজন সাহেব এসেছেন গাড়ী করে। তিনি ভেতরে আসতে চান।”

—সাহেব! এত রাতে!

গুরুভাইদের বিস্ময়ের সীমা নেই। এই রাতে তো কোনো সাহেবের আসার কথা নেই।

—তুই ঠিক বলছিস, সাহেব?

—হ্যাঁ, সাহেবই তো—হ্যাটকোট-পরা।

—আচ্ছা যা, চাবী নিয়ে যা। দরজা খুলে সাহেবকে নিয়ে আয় এইখানে।

চাবী থাকে স্বামী প্রেমানন্দের কাছে। তিনি মালীকে চাবী এনে দিলেন। চাবী নিয়ে মালী বাইরে এসে দেখে গাড়ি নেই, সাহেবও নেই। সে আবার ছুটে এলো স্বামিজীদের এই অদ্ভুত খবর দেবার জন্য। খবর কিন্তু আর দিতে হোল না। স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং একেবারে খাবার ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত।

—এ কী আপনি!

মঠের সন্ন্যাসীরা সবিস্ময়ে বলে ওঠেন একবাক্যে।

—হ্যাঁ আমিই তো। শিশুর মতোন হেসে বলেন স্বামী বিবেকানন্দ। “বাইরে সদর দরজা খুলতে দেরী হচ্ছিল, এদিকে

তোমাদের খাবার ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। পাছে আমি বাদ যাই, তাই পাঁচিল টপকে এলাম। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। দাও, খেতে দাও।”

চারদিকে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

সকলের সঙ্গে বসে স্বামিজী কলারপাতায় ঠাকুরকে নিবেদন-করা খিচুড়ী ভোগ খেলেন পরম তৃপ্তির সঙ্গে।

প্যারিসে প্রায় তিনমাস কাটিয়ে স্বামিজী অবশেষে ভারতের অভিমুখে যাত্রা করেন। এইবার তিনি ফিরবার পথে ভিয়েনা, এথেন্স, কনস্টান্টিনোপল, মিশরের রাজধানী কায়রো প্রভৃতি শহরগুলি দর্শন করেন। ঠিক কবে দেশে ফিরবেন কেউ জানত না। তিনি ইচ্ছে করেই এবার কাউকে কোনো খবর দেন নি। পাছে আগে থেকে খবর দিলে অভ্যর্থনার আয়োজন হয়, তাই এবার তিনি এইভাবে চলে আসেন। জাহাজ থেকে বোম্বাইতে নামেন। সেখান থেকে সোজা কলিকাতা। কলিকাতা থেকে গাড়ি করে একেবারে বেলুড়। পাছে কেউ চিনতে পারে, তাই গৈরিক বসন ছেড়ে কোট-প্যান্ট-হ্যাট পরেছেন। দিব্যকান্তি চেহারা, সাহেবী পোষাকে তাঁকে মানাত খুব সুন্দর।

বেলুড়ে দিনকতক কাটিয়ে স্বামিজী এলেন আলমোড়ায় মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে। তাঁর শরীর তখন খুব ভাল নয়। বিলেত থাকতেই তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন যে যাঁর ওপর মায়াবতী আশ্রম পরিচালনার ভার ছিল সেই তাঁর পরম ভক্ত ও শিষ্য মিঃ সেভিয়ার হঠাৎ মারা গিয়েছেন। এখানে এসে তাঁর শোকার্তা স্ত্রীকে তিনি সান্ত্বনা দিলেন এবং ‘প্রবুদ্ধভারত’ পত্রিকা পরিচালনা বিষয়ে তাঁর অন্যতম গুরুভাই স্বামী স্বরূপানন্দকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন। বললেন—“আমার শরীর সত্যিই ভেঙে পড়েছে,

আমি আর বেশি দিন বাঁচব না। এখন কি ইচ্ছে হয় জানো, সব কাজকর্ম ছেড়ে মঠে গিয়ে একটু নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করি।"

কিন্তু জগন্মাতা তাঁর এই সন্তানের ভাগ্যে বিশ্রামসুখ লেখেন নি। অসংখ্য কাজের মধ্যে তাঁর অবসর কোথায়? মায়াবতী মঠে কিছুদিন কাটিয়ে, ১৯০১ সালের প্রথমভাগেই স্বামিজী বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করলেন। এবার আহ্বান এলো পূর্ববঙ্গ ও আসাম থেকে। তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা তখন দিন দিন খারাপের পথে। তবু মার্চ মাসের মাঝামাঝি তিনি শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকা যাত্রা করলেন। লাঙলবন্ধে এসে পবিত্র ব্রহ্মপুত্রে স্নান করলেন। ঢাকাতেও তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ শেষ করে তিনি এলেন আসামে। এখানে কামাখ্যা মন্দির দর্শন করে কিছুদিন শিলঙ-এ কাটিয়ে তিনি অবশেষে ফিরলেন বেলুড় মঠে।

অক্টোবর মাসে তাঁর রোগ বৃদ্ধি পেল। গুরুভাইরা শঙ্কিত হলেন। অসুস্থ শরীরেও স্বামিজীর কাজের বিরাম ছিল না। মঠের উন্নতির কথা চিন্তা করা, ক্রমাগত লোকজনকে উপদেশ দেওয়ার ভেতর দিয়ে তাঁর জীবনের দিনগুলি এখন অতিবাহিত হয়। মঠকে জনপ্রিয় করবার জন্য খুব ধূমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতির প্রবর্তন করলেন।

১৯০২ সাল। স্বামিজীর জীবনের শেষ বৎসর।

জানুয়ারী মাসে বেলুড় মঠে দু'জন জাপানী পণ্ডিত এলেন। বিবেকানন্দ তাঁদের সঙ্গে বারাণসী ও বুদ্ধগয়া দর্শনে গেলেন। প্রথমে তিনি এলেন বুদ্ধগয়ায়। ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। একদিন তিনি নিবেদিতাকে বুদ্ধপ্রসঙ্গে বলেছিলেন: "আমি ভগবান বুদ্ধের দাসানুদাস। তাঁর সমতুল্য এ পর্যন্ত কে হয়েছে? তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর—নিজের জন্য কখনো একটি কাজ করেন নি। বিশাল হৃদয় দিয়ে সমস্ত জগৎকেই

আলিঙ্গন করেছিলেন তিনি। বাল্যকালে এই অধমকে একদিন দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন।"

বুদ্ধগয়া থেকে স্বামিজী এলেন কাশীধামে। এখানে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে ফিরে এলেন বেলুড়ে। এইবার কাশীতে তিনি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। দিন যায়। তাঁর শরীর ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এপ্রিল মাসে তিনি বিশেষভাবে পীড়িত হলেন। জুন মাসের শেষ সপ্তাহে স্বামিজী নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে, আর দেরী নেই। মৃত্যু আসন্ন। তিনি মহাপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হলেন। "আমি এইবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। একটা মহাতপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমার মধ্যে জেগেছে।" একদিন বললেন তিনি এই কথা তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতাকে।

৩রা জুলাই। ১৯০২ সাল।

স্বামিজী সেদিন নিজের হাতে পরিবেশন করে শিষ্যদের খাওয়ালেন এবং খাওয়া শেষ হলে নিজে তাদের হাতে জল ঢেলে দিলেন। সেদিন বেলুড়ে নিবেদিতাও উপস্থিত ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে চকিতে তাঁর মনে পড়ল—মারা যাবার আগে যীশুখৃষ্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। তবে কি আচার্যদেব সত্যই এবার দেহরক্ষা করবেন!

১৯০২। ৪ঠা জুলাই। শুক্রবার।

স্বামিজীর জীবনের শেষ প্রভাত। প্রত্যুষে তিনি ঘুম থেকে উঠলেন। কিন্তু অন্য দিনের মতোন আজ আর তিনি সকলের সঙ্গে একত্রে ধ্যানে বসলেন না। এমন ব্যতিক্রম এই প্রথম। শিষ্য ও গুরুভাইদের নিয়ে নানারকম গল্প করতে লাগলেন। একটু বেলা হোলে একবাটি চা পান করলেন। তারপর তিনি ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, ঘরের সব দরজা-জানলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমন তো তিনি কোনোদিন করেন

না। আজ তবে করলেন কেন? ব্যাকুল প্রশ্ন জাগে শিষ্য ও গুরুভাইদের মনে। এইভাবে তিন ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর ঠাকুর ঘরের সিঁড়ি বেয়ে তিনি এলেন সামনের খোলা মাঠে। পায়চারি করছেন আর আপনমনে গুণ্ গুণ্ করে গাইছেন: "মন, চল নিজ নিকেতনে।"

একদিন বালক নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের সম্মুখে বসে এই গানটি গেয়েছিলেন। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠে এই গানটি শুনে ঠাকুরের ভাবসমাধি হয়েছিল—তিনি একদৃষ্টে তখন তাকিয়ে ছিলেন নরেন্দ্রনাথের লাবণ্যমণ্ডিত মুখের পানে। আজ জীবন-সায়াহ্নে বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসীর কণ্ঠে শোনা গেল সেই গান—"মন, চল নিজ নিকেতনে।"

গুণ্ গুণ্ করে গান গাওয়া শেষ হোল। ধীরে ধীরে পায়চারি করেন। সম্মুখে স্বচ্ছ সলিলা ভাগীরথী কুল কুল শব্দে বয়ে চলেছে। স্বামিজী অস্ফুটস্বরে নিজের মনে বলছেন: "যদি এখন আর একজন বিবেকানন্দ থাকত, তাহোলে সে বুঝতে পারত, এই বিবেকানন্দ কী করে গেলো।"

দুপুরবেলা। মঠে খাবার ঘণ্টা পড়ল।

স্বামিজী ঘণ্টাধ্বনি শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই নীচের বারান্দায় নেমে এলেন এবং সকলের সঙ্গে একত্রে আহারে বসলেন। অসুস্থ হবার পর থেকে তিনি সকলের সঙ্গে একত্র আহার করতেন না। আজ হঠাৎ সেই নিয়মের ব্যতিক্রম কেন? কিন্তু কারো মনে কোন সন্দেহ দেখা দিল না, বরং তাঁর সঙ্গে একত্রে খাবার সৌভাগ্য লাভে সবাই যেন আজ আনন্দিত হোলেন।

—আজ কেমন আছেন, স্বামিজী? জিজ্ঞাসা করলেন এক ব্রহ্মচারী শিষ্য।

—অন্য দিনের চেয়ে আজ খুব ভাল আছি, বললেন তিনি।

খাবার পর আধঘণ্টা বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। তারপর মঠের ব্রহ্মচারীদের নিয়ে সংস্কৃত পড়াতে আরম্ভ করলেন। বিকেল হোল। স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে মঠের বাইরে বেড়াতে বেরুলেন। বেড়াতে বেড়াতে দুজনে একেবারে বেলুড় বাজার পর্যন্ত চলে এলেন। বেড়িয়ে যখন মঠে ফিরলেন তখন ঠাকুরের সন্ধ্যারতি আরম্ভ হয়েছে। আরতি হয়ে গেল। ব্রহ্মচারীরা একে একে এসে তাঁকে প্রণাম করে যায়। তারপর স্বামী বিবেকানন্দ ধীরে ধীরে নিজের শোবার ঘরটিতে এলেন। গঙ্গার দিকে মুখ করে ধ্যানে বসলেন। গঙ্গার পরপারে দেখা যায় দক্ষিণেশ্বরের পুণ্য সাধনপীঠ। একঘণ্টা পরে তাঁর ধ্যান ভাঙল। সেবক ব্রহ্মচারীটিকে বললেন, "ওরে, জানলাগুলো সব এবার খুলে দে।"

বাইরে জমাট অন্ধকার।

নিস্তরঙ্গ গঙ্গার জলে আলোর প্রতিবিম্ব কাঁপছে।

ওপরের আকাশে মিট মিট করে জ্বলছে অসংখ্য নক্ষত্র।

সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন জানলার কাছে।

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকালেন তিনি পরপারে দক্ষিণেশ্বরের দিকে।

তারপর তিনি ফিরে দাঁড়ালেন; তুলে নিলেন হাতে জপের মালা। বসলেন পদ্মাসনে।

একঘণ্টা পরে ধ্যান ভাঙল। এবার তিনি শুয়ে পড়লেন মেঝের ওপর বিছানো অজিন শয্যায়। সেই তাঁর শেষ শয়ন।

রাত নটা। চরাচর নিস্তব্ধ।

বিবেকানন্দের মাথা একটু হেলে পড়ল।

দেহ নিস্পন্দ ও স্থির।

স্বামী বিবেকানন্দ চিরনিদ্রায় অভিভূত হোলেন।

ক্লান্ত শিশু যেন মায়ের কোলে ঘুমুচ্ছেন—হাতে জপের মালা।

বাংলায় স্বদেশীযুগের উষাকে আহ্বান করে, বিংশ শতাব্দীকে স্পর্শ করে, ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ ইহজগৎ থেকে বিদায় নিলেন।

বাংলা তথা ভারতবর্ষে এক নবযুগের সূচনা করে দিয়ে, মানবসেবার মন্ত্রে তাঁর স্বদেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে, তাদের সামনে কর্মের এক নতুন আদর্শ রেখে দিয়ে, মহাপ্রয়াণ করলেন ত্যাগ, বৈরাগ্য ও স্বদেশপ্রেমের নবীন বিগ্রহ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

আমাদের জাতীয় জীবনের এক সন্ধিক্ষণে এসেছিলেন যুগপুরুষ বিবেকানন্দ। তিনি ছিলেন মানবতার পুরোহিত। পরিব্রাজক জীবনে তিনি ভারতবর্ষের পঙ্গু, নিপীড়িত মানুষদের পরিচয় পেলেন; চিনলেন প্রকৃত মানবতাকে, ভালবাসলেন, শ্রদ্ধা করলেন তাকে। তাঁর হৃদয়-বীণার তারে তারে বেজে উঠেছিল নতুন রাগিণী—মনুষ্যত্বের জয়গানে তা পূর্ণ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর ভগবানকে। তাইতো তিনি মানুষের সেবায় তাঁর বহু সাধের মুক্তিসাধনা পর্যন্ত অকাতরে দান করেছিলেন। বলেছিলেন:

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের কাহিনী শেষ হোল।

এইবার তাঁর মহান্ চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলব।

আমরা দেখলাম যে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে তিনি পাশ্চাত্যদেশে গিয়েছিলেন এবং প্রায় চার বছর ঐ দেশে অতিবাহিত করেন। কিন্তু এজন্য তাঁর আচারে-আচরণে কোনো পরিবর্তন হয়নি কিম্বা তিনি সাহেব বনে যাননি। ভারতীয় আচার ব্যবহার ও আদর্শে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। পাশ্চাত্যের বর্ণাঢ্য সভ্যতা, তার সম্পদের জাঁকজমক কিছুই তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কল্যাণের মধ্যে দেখেছিলেন অভিশাপ আর অমঙ্গল। দেখেছিলেন ক্লেশ, হিংসা, দ্বেষ ও হানাহানির জঘন্য চিত্র। তাই তিনি পাশ্চাত্যকে প্রাচ্যের সুমহান আত্মিক সাধনার বাণী শুনিয়ে এলেন। "I have a message for the West"—এই ছিল তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা। এই বাণী শুনিয়ে পৃথিবীর উভয় গোলার্ধের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন; "স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের সেতু।" তিনি পাশ্চাত্যের অন্ধ গর্বনাশ করলেন। তারা মনে করতো, তারা উন্নত, সভ্য আর সংস্কৃতি সম্পন্ন জাতি। তাদের আছে অপরিসীম বাহুবল। তাদের কাছে পৃথিবী অবনত হবে। কিন্তু

ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী পাশ্চাত্যের সে দর্প, সে অভিমান চূর্ণ করে দিলেন চিকাগোর বিশ্বধর্ম সম্মেলনের মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আর লণ্ডনের বহু বক্তৃতা মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে। পাশ্চাত্য বুঝলো প্রাচ্যকে, বুঝলো ভারতীয় সভ্যতার চিরন্তন মহিমাকে। সে দিলো শ্রদ্ধার উপঢৌকন সন্নাসীর চরণে। এইভাবে চার বছর ধরে অক্লান্ত প্রচারের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে আর ভারতের সুমহান ধর্মকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জীবন-সাধনাকে সফল করেছিলেন।

বিজয়ী সন্ন্যাসী স্বদেশে ফিরে এসে কি করলেন?

এখানে এসে তিনি প্রচার করলেন এক নবধর্ম।

মানবতার ধর্ম।

দরিদ্রনারায়ণের সেবার ধর্ম।

মন্দিরের প্রাণহীণ বিগ্রহের পূজা-অর্চনা থেকে তাঁর স্বদেশবাসীর মনকে ফিরিয়ে 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'— এই আদর্শের বেদীমূলে সেই মন সঁপে দিতে বললেন। এই কাজ করতে গিয়ে প্রবল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হোল তাঁকে। একদল লোক তাঁর এই কাজে বাধা দিতে লাগলো। কিন্তু সেই সিংহ-প্রতিম পুরুষের কাছে তাদের সব বাধা ভেসে গেল। আমেরিকা থেকে তিনি কিছু টাকা সংগ্রহ করে এনেছিলেন। তাই দিয়ে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপন করলেন। মঠে হবে ইষ্টদেব শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা-অর্চনা ও তাঁর মহান্ আদর্শের অনুশীলন আর মিশন করবে সেবাধর্মের প্রচার, অশিক্ষিতদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং জনগণের ইহলৌকিক কল্যাণসাধন। এক কথায়, দুঃস্থ ও দরিদ্র ভারতবাসীর নিঃস্বার্থভাবে

সেবা করা। মঠে চলে ধর্মশিক্ষা তরুণ সন্ন্যাসীদের নিয়ে আর মিশনের কাজ হোল দেশের কথা চিন্তা করা ও দেশবাসীদের সবরকমে সাহায্য করা। কিভাবে তিনি সন্ন্যাসীদের অনুপ্রাণিত করতেন তার একটা দৃষ্টান্ত এখানে দিই।

বেলুড় মঠ তখনো ভাড়াটে বাড়িতে। একদিন এক শিষ্যকে স্বামীজী বলছেন—কি হবে আর চাকরি করে? না হয় একটা ব্যবসা কর। শিষ্য তখন এক স্থানে একটি প্রাইভেট মাষ্টারি করে মাত্র। স্বামিজী বললেন—অনেকদিন মাষ্টারি করলে বুদ্ধি খারাপ হয়ে যায়; জ্ঞানের বিকাশ হয় না। দিনরাত ছেলের দলে থেকে থেকে ক্রমে জড়বৎ হয়ে যায়। আর মাষ্টারি করিস্ নি।

শিষ্য। তবে কি করব?

স্বামিজী। কেন? যদি তোর সংসারই করতে হয়, যদি অর্থ উপায়ের স্পৃহা থাকে তবে যা—আমেরিকায় চলে যা। আমি ব্যবসায়ের বুদ্ধি দেব। দেখবি পাঁচ বছরে কত টাকা এনে ফেলতে পারবি।

শিষ্য। কি ব্যবসায় করব? টাকাই বা কোথা হতে পাব?

স্বামীজী। পাগলের মত কি বকছিস্? ভেতরে অদম্য শক্তি রয়েছে। শুধু 'আমি কিছু নই' ভেবে ভেবে বীর্যহীন হয়ে পড়েছিস! একবার বেড়িয়ে আয়—দেখবি ভারতের বাইরের লোকের জীবন প্রবাহ কেমন তর্ তর্ করে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। আর তোরা কি করছিস?

শিষ্য। মনে যে সাহস পাই না বাইরে বেরুতে।

স্বামিজী। ঐ তো তোদের দুর্বলতা। জুতো খেয়ে খেয়ে—দাসত্ব করে তোরা কি আর মানুষ আছিস। সেই জন্যেই তো তোদের এমন দুর্দশা। তোরা আবার তোদের বেদ-বেদান্তের বড়াই করিস।

শিষ্য। আপনি কি করতে বলেন ?

স্বামিজী। পরের মুখাপেক্ষী হয়ে কেন জীবনধারণ করবি ? আগে অন্নবস্ত্রের সংস্থান কর। ধর্ম কর্ম এখন গঙ্গার জলে ভাসিয়ে আগে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হ। ওরে ধর্ম কর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই, পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির।

শিষ্য। তাহোলে বলছেন ধর্মচিন্তার চেয়ে অর্থচিন্তা বড়ো।

স্বামিজী। আলবৎ বড়ো। ধর্ম এখন শিকেয় তোলা থাক। ধর্মকথা শোনাতে হলে আগে দেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে।

শিষ্য। কি উপায়ে অন্নের সংস্থান হতে পারে ?

স্বামিজী। উপায় তোদেরই হাতে রয়েছে। চোখে কাপড় বেঁধে বলছিস ; 'আমি অন্ধ, কিছুই দেখতে পাই না।' চোখের বাঁধন ছিঁড়ে ফেল, দেখবি মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণে জগৎ আলো হয়ে রয়েছে। টাকা না জোটে তো জাহাজের খালাসী হয়ে বিদেশে চলে যা।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে আমরা কি দেখতে পাই ?

দেখতে পাই যে, একদিকে উদগ্র স্বদেশপ্রেম ও তীব্র স্বাজাত্যাভিমান আর অন্যদিকে উদার অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রীতি— এই দুটি জিনিসের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে তাঁর জীবনে। দেশপ্রেমের দাবানল বুকে নিয়ে তিনি সারা ভারতবর্ষ ও পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছেন। স্বামজীর শিক্ষাটা কি ? একটি মহান্ মন্ত্র তিনি আমাদের শিখিয়ে গিয়েছেন। সেই মন্ত্র হোল—ঈশ্বরে বিশ্বাস, নিজেদের উপর বিশ্বাস। নিজের উপর বিশ্বাস উপনিষদের চিরসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদ্ বলেছেন "আমিই আত্মা।

খড়্গ আমাকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারে না। কোনো অস্ত্র পারে না ভেদ করতে। আগুন পারে না দহন করতে। বাতাস পারে না শুষ্ক করতে। আমি সর্বব্যাপী, অনন্ত। আমি সর্বজ্ঞ।" এই মহামন্ত্রই স্বামী বিবেকানন্দ অবিরাম তাঁর স্বদেশবাসীর কানে শুনিয়েছিলেন।

তাঁর চরিত্র যতই অনুশীলন করা যায় ততই দেখা যাবে যে, স্বামিজী ভারতের জাতীয় জীবনের অভিশাপরূপ পরাধীনতার অবসান মনে-প্রাণে কামনা করতেন। তিনি ভারতবাসীর ভীরুতা এবং জাতীয় জীবনের বহুবিধ অনাচার ও কলঙ্কের প্রতি তীক্ষ্ণ কষাঘাত করে স্বাধীনতা আয়ত্ত করবার জন্য ভারতবাসীকে শক্তি সাধনায় উদ্বুদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়ে বলে গেছেন; "হায় ভারত! তুমি কি কেবল এই পাথেয় সম্বল করে সভ্যতা ও মহত্ত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে চাও? যে স্বাধীনতা কেবল সাহসী ও বীরেরাই আয়ত্ত করতে পারে সেই স্বাধীনতা কি তুমি তোমার লজ্জাকর ভীরুতা দ্বারা লাভ করতে পারবে? সকলের আগে শক্তিমান হও। পৌরুষত্ব লাভ কর।"

এই মহান সন্ন্যাসী কেবল অতীত ভারতের গৌরবের কথাই প্রচার করে যান নি। তিনি ছিলেন নূতন আশা, ভারতের জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতার অগ্রদূত। তিনিই প্রথম সন্ন্যাসী যিনি জ্ঞান, শক্তি ও আশার আলোক-বর্তিকা হাতে নিয়ে ভারতের তরুণদের স্বাধীনতালাভের নূতন পথের সন্ধান দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর দু-তিন বছরের মধ্যে বাংলায় যে বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রাম দেখা দিয়েছিল তার মূলে ছিল সন্ন্যাসীর শক্তিমন্ত্রের বিপুল প্রভাব। "আমার কথা ধরতে গেলে, আমি আমার স্বদেশবাসীদের উন্নতির জন্য এই যে কাজে হাত দিয়েছি, সেটা সম্পন্ন করবার জন্য দরকার হোলে দু'শোবার জন্ম নেব।"—এই ছিল সেই মহাজীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

স্বামিজী বলেছেনঃ "আমি মানুষ চাই—চাই মানুষ—মানুষ খুঁঝতে আমি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছি। আমি ভারতবর্ষের লোককে মানুষের ভেতর মানুষ হোতে দেখতে চাই; দেবতা দেখতে চাই না। দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে দময়ন্তীলাভের জন্য শ্রেষ্ঠ দেবতারা এসেছিলেন। কিন্তু দময়ন্তী বললেন—আমি নারী, নর চাই, দেবতায় আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমিও তেমনি দেবতা চাই না, মানুষ চাই। তন্ত্রমন্ত্রে কোনো কাজ উদ্ধার করতে চাই না। মানুষের মত সকল কাজ করতে চাই।"

যে সর্বজম-হিতকামী গভীর পবিত্র অন্তঃকরণ থেকে একদা এই কথা উঠেছিল, তা কি ব্যর্থ হয়েছে? দেশ তার উত্তর দেবে। দেশ বলবে, মানুষ মানুষের মত সহ্য করতে শিখেছে কিনা? মানুষ মানুষের জন্য কাঁদতে শিখেছে কিনা? মানুষ মানুষের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছে কিনা? সকল বিষয়ে মনুষ্যত্বলাভ করেছে কিনা?

পুরুষ-সিংহ ছিলেন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। তাঁর জীবনের একটি কাহিনী এখানে বলি। স্বামিজী ট্রেণে চলেছেন রাজপুতানার ভেতর দিয়ে। তিনি যে কামরায় আসছিলেন সেই কামরাতে দুজন ইংরেজ ছিল। তাঁরা স্বামিজীকে নিরক্ষর সাধু মনে করে নিজেদের মধ্যে নানারকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও হাসাহাসি করছিল। কিছুদূর গিয়ে ট্রেণ একটা ষ্টেশনে থামলে স্বামিজী ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে ইংরেজিতে একগ্লাস খাবার জল চাইলেন। সাহেব দুটো যখন দেখলো যে, তিনি ইংরেজি জানেন এবং তারা যা বলাবলি করছিল সব বুঝতে পেরেছেন, তখন একটু অপ্রতিভ হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলোঃ "আপনি আমাদের কথা বুঝতে পেরেও কোনোরকম

রাগ প্রকাশ করলেন না কেন?" তাতে তিনি উত্তর করলেন: "বন্ধুগণ, মূর্খলোকের সংসর্গে আসা আমার জীবনে এই প্রথম নয়। আমি ঢের বেকুব দেখেছি।" সাহেব দুজন এই কথা শুনে অপমানিত বোধ করলো—উত্তেজিতও হোল এবং অবশেষে তাঁকে আক্রমণ করবার উদ্যোগ করলো। কিন্তু তাঁর সুগঠিত শরীর আর দৃঢ় তেজোব্যঞ্জক মূর্তি দেখে নিরস্ত হোল ও ক্ষমা প্রার্থনা করলো। এই দুর্জয় সাহসের বলেই তিনি চিকাগো ধর্মমহাসভায় হাজার হাজার শিক্ষিত নর-নারীর সামনে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াতে পেরেছিলেন।

স্বামিজী বলেছেন—"চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য হয় না। মহৎ কার্য করতে হোলে তিনটি জিনিসের দরকার, যথা হৃদয়বত্তা, ব্যবহার কুশলতা আর প্রাণপণ অধ্যবসায়।" এই তিনটি বিষয়ে তাঁর উপদেশ এই রকম। হৃদয়বত্তা সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করছ যে, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরছে এবং কোটি কোটি ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরে অর্ধাশনে কাটাছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝেছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমস্ত ভারতবর্ষের আকাশকে আচ্ছন্ন করেছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়েছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সঙ্গে কি এই ভাবনা মিশে গিয়েছে? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করে তুলেছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, তবে স্বদেশ-হিতৈষী হবার প্রথম ধাপে মাত্র পদার্পণ করেছ।"

ব্যবহার কুশলতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "এই দুর্দশা প্রতিকারের কোন উপায় স্থির করেছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করে কোন কার্যকর পথ বের করেছ কি? মানলাম, তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝেছ—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দশা প্রতিকারের কোন উপায় স্থির করেছ কি? লোককে গালি না দিয়ে তাদের কোন যথার্থ সাহায্য করতে পার কি? স্বদেশবাসীর এই জীবন্মৃত অবস্থা দূর করবার জন্য তাদের এই ঘোর দুঃখে কিছু সান্ত্বনাবাক্য শোনাতে পার কি? যদি পার, তবে বুঝতে হবে তুমি দ্বিতীয় ধাপে মাত্র পদার্পণ করেছ।"

আর অধ্যবসার সম্বন্ধে বলেছেন: "কিন্তু এতেও হোল না। আরো একটি জিনিসের প্রয়োজন—প্রাণপণ অধ্যবসায়। তুমি যে দেশের কল্যাণ করতে যাচ্ছ, বলো দেখি তোমার আসল অভিসন্ধিটা কি? নিশ্চিত করে কি বলতে পার যে কাঞ্চন, মান-যশ বা প্রভুত্বের বাসনা তোমার এই হিতাকাঙ্ক্ষার পেছনে নেই? তোমরা কি পর্বতপ্রায় বাধাবিঘ্নকে তুচ্ছ করে কাজ করতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারিহস্তে তোমাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়, তথাপি তোমরা যা সত্য বুঝেছ, তাই করে যেতে পার? ফল কামনা করো না—কেবল নিজের কর্তব্য করে যাও। তা হোলেই দেখবে স্বদেশসেবার তৃতীয় এবং শেষ ধাপে তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ।"

বহু বৎসর বিদেশী শাসনের পদতলে থেকে ভারতবাসী দুর্বল হয়ে পড়েছিল। প্রাণে আশা, কণ্ঠে ভাষা, মুখে আনন্দ ছিঁলো না। নিরন্ন, বিবস্ত্র, অশিক্ষিত হয়ে কাপুরুষের মতোন জীবন যাপন করছিলো।

কাপুরুষতার কালো রূপ আর্যজাতির ভারতবর্ষকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছিলো। ভারত ভুলেছিলো তার বৈদিকযুগের সুমহান আদর্শ—মানুষের মতো বাঁচবার বলিষ্ঠ ধর্ম। বিদেশী রাজের নিপীড়ন-প্রধান শাসনচক্রে নির্বীর্য ভারতবাসীর স্মৃতির দর্পনে প্রাচীন মুনিঋষি-নির্দিষ্ট আদর্শ দেশ, সমাজ ও জীবন-প্রণালীর জীবন্ত প্রতিরূপ ফুটে ওঠে নি। ভারত বিদেশীর আত্মভোগসর্বস্ব স্বার্থভরা ক্ষণভঙ্গুর সভ্যতার চোখ-ধাঁধাঁনো আলোয় মেতে উঠলো। কেউ কেউ ভারতীয় আদর্শ, কৃষ্টি ও ধর্ম আজীবনের মত পরিহার করে বিজাতির ধর্ম ও কৃষ্টির নির্দেশানুযায়ী জীবন চালাতে লাগলো। এভাবে বহু ভারতবাসী অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের পাকচক্রে পড়ে মহান ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মের বেদীমূল হতে পথভ্রষ্ট হয়ে এসে পড়লো ইংরেজী সভ্যতার নবদ্বারবিশিষ্ট অন্তঃপুরে। ভারতীয়গণ ভুলে গেলো তাদের জাতীয় মাহাত্ম্য। অজ্ঞানতা ও অচেতনতা আনলো তাদের মনে মোহ চোখ-ধাঁধানো বিদেশী ধর্ম ও সভ্যতার প্রতি। তাই দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বহু ভারতীয় নিজের ধর্ম-কর্ম বিসর্জন দিয়ে গ্রহণ করলো ইংরাজের ধর্ম-কর্ম।

ম্লান হয়ে গেলো ভারতের আত্মজ্যোতি। ভারতীয় মহান কর্মব্রতে পাপ প্রবেশ করে এই মহাজাতিকে পঙ্গু করে ফেললো। এক কথায়, পাশ্চাত্যের করাল গ্রাসে ভারতের সর্ববিষয়ে সর্বসুখ ও ঐশ্বর্য বিনাশিত হলো। দুর্বল ভারত পরাধীনতার কঠিন লৌহশৃঙ্খল বরণ করতে বাধ্য হোল। ভারতীয় মহাজীবনের কোনো-ক্ষেত্রে স্বাধীনতার শেষ মিনারটিও টিঁকে রইলো না। সমস্তই একে একে ভূপতিত হোল শোষক রাজা, সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের সুকৌশল আক্রমণে।

বাংলা তথা ভারতীয় ধর্ম-জগতে গ্লানি আসার দরুণ কেবলমাত্র

ইংরাজরাজ দায়ী এ কথা ঠিক বলা যায় না। আমরাও কিছুটা দায়ী। স্বামিজী বলেছেন, "আমরাই সর্বপ্রথম আমাদের দুর্দশা, অবনতি ও কষ্টের জন্যে একমাত্র দায়ী। আমাদের অভিজাত পূর্বপুরুষগণ ভারতীয় জনসাধারণকে পদদলিত করতে লাগলেন। ক্রমশঃ তারা অসহায় হয়ে পড়লো। এই অবিরত অত্যাচারে দরিদ্র ব্যক্তিরা, তারা যে মানুষ তাও ক্রমশঃ ভুলে গেলো। শত শত শতাব্দী ধরে তারা বাধ্য হয়ে (ক্রীতদাসের মত) কেবল জল তুলেছে ও কাঠ কেটেছে। তাদের এই বিশ্বাস করতে শেখানো হয়েছে যে গোলামী করবার জন্যেই তাদের জন্ম, তাদের জন্ম জল তোলা, কাঠ কাটবার জন্যে। আর যদি কেউ তাদের প্রতি দয়াপ্রকাশক দু' একটা কথা বলতে চায়, তবে আধুনিক কালের শিক্ষাভিমানী আমাদের প্রজাতীয়গণ, এই পদদলিত জাতির উন্নতি-সাধনে সঙ্কুচিত হয়ে থাকেন।"

আমাদের দেশে কয়েকজন দাম্ভিক ও সংস্কৃতশিক্ষাভিমানী এবং অভিজাত শ্রেণীর কয়েকজন ব্যক্তির করায়ত্ত ছিলো ধর্মশাস্ত্র। সাধারণ লোক জানতে পারতো না শাস্ত্রব্যাখ্যা কি জিনিস এবং কেমন-তরো তার রূপ। সাধারণের প্রতি পণ্ডিতসমাজের তেমন সহানু-ভূতি ছিলো না, পরন্তু তাদের জ্ঞানস্পৃহাকে দমিয়ে রাখবার জন্যে যতকিছু অপকৌশল সে সমস্তই পণ্ডিতগণ একে একে প্রয়োগ করেছিলেন। ফলে, তারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়ে সমাজের নীচের তলায় ঘোরতম দুঃখের আগারে দিন যাপন করতে লাগলো। অন্তরে সুখ নেই। অসন্তোষের বহ্নি তুষের আগুনের মতোন জ্বলছিলো। এমন সময় এলো ইংরাজ। ইংরাজের সহজ সাবলীল ধর্মজগতের ব্যাখ্যা শুনে তাদের মন মেতে উঠলো এক অজানা আনন্দে। ধর্মে বাহ্যিক স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে বহির্মুখী আশাহত হৃদয় আশা ও আনন্দে পরিপূর্ণ হোল। অস্পষ্ট ও জটিল স্বধর্মের

নাগপাশকে এড়িয়ে চলে এলো স্পষ্ট, সরল পরধর্মের রাজদেউলে। গ্রহণ করলো পরধর্ম। এভাবে ভারতীয় ধর্মসমাজের একদিকে ভাঙন ধরলো।

দেশের এই ঘোরতর দুর্দিনে ভারতের মহান জাতিকে পরধর্ম ও সভ্যতার মোহপাশ হতে মুক্ত করবার মন্ত্রশক্তি নিয়ে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বললেন, "যত মত তত পথ"। তার নিগূঢ় অর্থ হচ্ছে, কেউ কারও প্রতি হিংসা করো না। প্রত্যেকে নিজের নিজের ধর্মপথে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারো? হিন্দুকে খৃষ্টান হতে হবে না বা খৃষ্টানকে হিন্দু হতে হবে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মে আসীন থাকবে। নিজের নিজের ধর্মমতের ভেতর দিয়েই পরম প্রেমময় ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু এই কথা বলে ক্ষান্ত হন নি। তিনি তাঁর নিজের জীবনে বিচিত্র সাধনা দিয়ে দেখিয়ে গেছেন আমরা কে এবং কি আমাদের ধর্ম।

তিনি সর্বধর্মের সমন্বয় করেছেন। সকল ধর্মমতের মধ্য দিয়ে সাধনা করে সেই এক প্রেমময় সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁর মানস সন্তান 'নরেন', প্রিয়তম শিষ্য বিবেকানন্দ প্রচার করলেন তাঁর সেই মহান সাধনদর্শন ভারতের ঘরে ঘরে—বিশ্বের দরবারে।

স্বামিজী বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্-গীতা প্রভৃতি ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ-সাগর মন্থন করে সারামৃত তুলে ধরলেন জ্ঞানহারা, আত্মবিস্মৃত কাপুরুষ ভারতীয়দের সামনে। স্বামিজীর জ্ঞানরবির খরপ্রভায় কাটতে লাগলো ভ্রমের তামসী অন্ধকার। হিন্দু ধর্মত্যাগীরা আপশোষ করতে লাগলো। ধর্মত্যাগে উদ্যতপরায়ণ মানবমানবী পিছিয়ে পড়লো। নতুন ধর্মগ্রহণের পথে আর এগুলো না। ফিরে গেলো আপন ঘরে—ঋষিনির্দিষ্ট অমৃতের সংসারে।

নিকটতম আত্মীয়স্বজনকে একরূপ অনাহারে মরতে দেখেছি। আমাকে লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা করেছে। জুয়াচোর ও বদ্‌মাস বলেছে। আমি এ সমস্তই সহ্য করেছি তাদের জন্যে যারা আমায় উপহাস ও অবজ্ঞা করেছে। বৎস! এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু মহাপুরুষগণের শিক্ষালয় স্বরূপ। লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের হৃদয়-বেদনা অনুভব করো, অকপট হয়ে এদের জন্যে ভগবানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। সাহায্য আসবেই আসবে। আমি বর্ষের পর বর্ষ ধরে এই চিন্তাভার মস্তিষ্কে ও এই দুঃখভার হৃদয়ে ধারণ করে ভ্রমণ করেছি। তথাকথিত ধনী ও বড়লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়েছি। অবশেষে হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করতে করতে অর্দ্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করে এই সুদূর বিদেশে সাহায্যলাভের প্রত্যাশায় উপস্থিত হয়েছি। ভগবান দয়াময়! তিনি অবশ্যই সাহায্য করবেন। আমি এই দেশে (আমেরিকাতে) শীতে ও অনাহারে মরতে পারি, কিন্তু হে যুবাগণ! আমি তোমাদের কাছে দরিদ্র, পতিত পীড়িতগণের জন্যে এই প্রাণপণ চেষ্টা দায় স্বরূপ অর্পণ করছি। তোমরা এই বিশকোটি নরনারীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করো—যারা দিন দিন গভীরতম অজ্ঞানান্ধকারে ডুবছে। প্রভুর নাম জয়যুক্ত হোক—আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য হবো। এই চেষ্টায় শতজন প্রাণত্যাগ করতে পারে, আবার সহস্রজন এই কাজের জন্যে প্রস্তুত হবে। বিশ্বাস—সহানুভূতি—অগ্নিময় বিশ্বাস আর জ্বলন্ত সহানুভূতি, এই সম্বল করে অগ্রসর হও—অগ্রসর হও।

"যে অপরকে স্বাধীনতা দেবার জন্যে প্রস্তুত নয়, সে কী স্বাধীনতা লাভের যোগ্য! অনাবশ্যক হা-হুতাশ ও বিলাপ না করে আসুন আমরা দৃঢ়চিত্তে মানুষের মত কাজে লেগে যাই। আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি, যে বস্তু যার সত্যিকার প্রাপ্য, তা হতে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারে না। আমাদের অতীত

মহৎ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমাদের ভবিষ্যৎ মহত্তর হবে সন্দেহ নেই। শঙ্কর আমাদিগকে পবিত্রতা, ধর্ম ও অধ্যবসায়ের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ রাখুন।

"জাপানীরা বর্তমানকালে কি প্রয়োজন তা বুঝেছে—তারা সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হয়েছে। আর তোমরা কি কোরছো? সারাজীবন কেবল বাজে বোক্‌ছো। এসো, এদের দেখে যাও, তারপর যাও, গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরা-জীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাতি যায়!! এই হাজার বছরের জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যা-খাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে শক্তিক্ষয় কোরছো! পৌরোহিত্য-রূপ আহাম্মকির গভীর ঘুর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছো। শত শত যুগের অবিচ্ছিন্ন সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমাদের কি আছে বল দেখি? আর তোমরা এখন কোরছোই বা কি? আহাম্মকি, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পাইচারী কোরছো। ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এককণা মাত্র—তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছো, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০৲ টাকার কেরানীগিরির ওপরে পড়ে আছে। না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকীল হবার মতলব কোরছো। ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্বোচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছেলের আশে-পাশে একপাল ছেলে—তার বংশধরগণ—'বাবা খাবার দাও, খাবার দাও' করে উচ্চ চীৎকার তুলছে!! বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সব ডুবিয়ে ফেলতে পারো না?

"এসো, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও।

কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখনো ভাল কথা শুনবে না—তাদের হৃদয়ও শূন্যময়, তার কখনো প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের মধ্যে তাদের জন্ম, আগে তাদের নির্মূল করো। এসো, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখো, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে! তোমরা কি মানুষকে ভালোবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালোবাসো? তা'হলে এসো, আমরা ভাল হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে চেও না—অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেও না—সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্ততঃ এরূপ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়।

"আমরা যে সবাই আহম্মকের দল—স্বার্থপর। কাপুরুষ! মুখে স্বদেশহিতৈষণার কতকগুলি বাজে বুলি আওড়াচ্ছি। আর আমরা মহাধার্মিক এই অভিমানে ফুলে রয়েছি। মাদ্রাজীরা অপেক্ষাকৃত চটপটে ও দৃঢ়তা সহকারে একটা বিষয়ে লেগে থাকতে পারে বটে, কিন্তু হতভাগাগুলি সকলেই বিবাহিত! বিবাহ! বিবাহ!! বিবাহ!!! পাষণ্ডেরা যেন ঐ একটা কর্মেন্দ্রিয় নিয়ে জন্মেছে—যোনিকীট—এদিকে আবার নিজেদের ধার্মিক ও সনাতন প্রথাবলম্বী বলে পরিচয়টুকু দেওয়া আছে! অনাসক্ত গৃহস্থ হওয়া অতি উত্তম কথা কিন্তু এখন ওর ততটা প্রয়োজন নেই। চাই এখন অবিবাহিত জীবন। যাক্ বালাই! বেশ্যালয়ে গমন করলে লোকের মনে ইন্দ্রিয়াসক্তির যতটা বন্ধন উপস্থিত হয় আজকালকার বিবাহ প্রথায় ছেলেদের ঐ বিষয় প্রায় তদ্রূপ বন্ধন উপস্থিত হয়। এ আমি বড় শক্ত কথা বললুম। কিন্তু বৎস, আমি চাই এমন লোক, যাদের পেশীসকল লোহার মত দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত-নির্মিত হবে। আর তাদের শরীরের ভেতর এমন একটি মন বাস করবে, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। চাই বীর্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ!

আমাদের সুন্দর সুন্দর ছেলেগুলি—যাদের ওপর সব আশা করা যায়, তাদের সব গুণ সব শক্তি আছে—কেবল যদি এরূপ লাখো লাখো ছেলেকে বিবাহ নামে কথিত পশুত্বের বেদীর সামনে হত্যা না করা হোত। হে প্রভো, আমার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করো। মাদ্রাজ তখনি জাগবে যখন ওর হৃদয়ের শোণিত স্বরূপ অন্ততঃ একশো শিক্ষিত যুবক সংসার হতে একেবারে স্বতন্ত্র হয়ে কোমর বাঁধবে ও দেশে দেশে সত্যের জন্যে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হবে। ভারতের বাইরে এক ঘা দিতে পারলে, ওর ভেতরের অযুত ঘায়ের তুল্য হয়। যাহোক, যদি প্রভুর ইচ্ছে হয় সব হবে।

"এই একটা ধারণা আমার কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সকল দুঃখের মূলে আছে অজ্ঞতা, তাছাড়া আর কিছু না। জগৎকে আলোক দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্য এবং যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। যাঁরা জগতে সর্বাধিক সাহসী ও বরেণ্য তাঁদের চিরদিন 'বহুজন-হিতায় 'বহুজনসুখায়' আত্মবিসর্জন করতে হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রয়োজন আছে।

"জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন ব্যঙ্গমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। জগতের এখন যা একান্ত প্রয়োজন, তা হচ্ছে চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত ও যারা স্বার্থহীন। সেই প্রেম প্রত্যেকটি বাক্যকে বজ্রের ন্যায় শক্তিশালী করে তুলবে। এটা আর তোমার কাছে কুসংস্কার নয় নিশ্চিত। তোমার মধ্যে একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি আছে, আর ধীরে ধীরে আরো অনেকে আসবে। আমরা চাই—জ্বালাময়ী বাণী এবং তদপেক্ষা জ্বালাময় কর্ম। হে মহাপ্রাণ, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে? এসো, আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না

অন্তরের দেবতা বাইরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে বড় কি আছে, এর চেয়ে মহত্তর কোন কাজ আছে? আমার এগিয়ে চলার সাথে সাথেই আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি সব এসে পড়বে। আমি আটঘাট বেঁধে কোন কাজ করি না। কর্মপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও নিজের কাজ করে। আমি শুধু বলি ওঠো—জাগো।

"সেই একমাত্র আত্মাকেই জানো, আর অন্য সব বাক্য ত্যাগ করো। জগতের দিকে দিকে ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত আমাদের এই-টুকুই; শিক্ষা লাভ হয়। আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে, সমগ্র মানবজাতিকে এই বলে ডাকা, 'ওঠো, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুচ্ছো ততদিন থেমো না।' ধর্ম মানে ত্যাগ, আর কিছু নয়।"

পরপদানত ঘুমন্ত জাতিকে এইভাবে জাগিয়ে তুলেছিলেন স্বামিজী তাঁর উদাত্ত জাগরণী মন্ত্রে। ইতিহাসের অলিন্দে সেই মন্ত্রই আজ প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের শততম জন্মজয়ন্তী উৎসব প্রতিপালিত হোল সারা দেশে। আমরা নতুন করে তাঁকে স্মরণ করবার সুযোগ পেলাম। একশো বছর হয়ে গেল, তিনি আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ষাটবছর অতীত হয়ে গেল, তিনি মহাপ্রয়াণ করেছেন। তাই ভারতবর্ষ 'স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি' বিবেকানন্দকে নতুন করে স্মরণ করলো। আমরা দেখলাম বিচিত্র তাঁর জন্মকাহিনী, বিচিত্র তাঁর কর্মের ইতিহাস, বিচিত্র তাঁর জীবনবেদ—আর তেমনি অকল্পিত বৈচিত্র্যে মহিমান্বিত সেই সন্ন্যাসীর মহাপ্রয়াণ। বীরেশ্বর, নরেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ—তাঁর এই তিনটি নাম। তিনটিতেই তিনি সার্থকনামা ছিলেন। ধন্য সেই দেশ, যে তাঁকে আপন পুত্ররূপে অঙ্কে লাভ করেছিল। ধন্য সেই জগত ও

মানবগোষ্ঠী, যে তাঁকে আচার্যরূপে, নবযুগস্রষ্টারূপে, প্রত্যক্ষ করেছিল।

বিবেকানন্দ আমাদের সামনে সন্ন্যাসের একটা নতুন আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন। তাঁর পরিব্রাজক জীবনের একটা ঘটনা এখানে বলি। স্বামিজী তখন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ভ্রমণ করছেন। একদিন ট্রেণ থেকে তিনি নামলেন তাড়িঘাট জংশনে। দুপুরবেলা। সূর্যের প্রচণ্ড তেজ। মরুময় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বালুকারাশি অগ্নিতুল্য ভীষণ আকার ধারণ করেছে। মাঝে মাঝে বইছে উত্তপ্ত ঘুর্ণিবায়ু। সন্ন্যাসীর হাতে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ও কম্বল; পরিধানে গেরুয়া আলখাল্লা। সঙ্গে আর কিছু নেই—এমন কি একটা জলপাত্র পর্যন্ত নয়। কি দরকার এসবের ? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন: "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।" কথাটা যাচাই করে নিতে চাইলেন একবার তিনি। এই-ই তাঁর স্বভাব। একে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, তার উপর সন্ন্যাসী। চৌকিদার তাঁকে ষ্টেশনের প্লাটফর্মে ছায়ায় বসতে দিল না। তিনি অগত্যা কম্বলখানি বিছিয়ে, উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর পাতলেন ও বিশ্রামাগারের বাইরে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে সেই কম্বলের উপর বসে পড়লেন।

আশে পাশে অনেক লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তার মধ্যে ছিল একজন মধ্যবয়সী বেনে। বেনেটি একটু দূরে স্বামিজীর ঠিক সম্মুখে ষ্টেশনের ছাউনীর নীচে একটা সতরঞ্চির উপর বসে ছিল। স্বামিজীর বিশুষ্ক বদন ও ঘর্মাক্ত কলেবর দেখে সে নানারূপ বিদ্রূপ ও তামাসা শুরু করে দিলো। লোকটি ও তার কয়েকজন সহচর গাড়িতে স্বামিজীর সঙ্গে একসঙ্গে এসেছে; গাড়িতেও তাঁকে যথেষ্ট বিরক্ত করেছে। স্বামিজী তৃষ্ণার্ত হয়ে কয়েকটা ষ্টেশনে খাবার জল সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সঙ্গে একটি পয়সা

না থাকাতে কোনো পানিপাঁড়েই সন্ন্যাসীকে জল দেয় না। যারা পয়সা দিচ্ছিল, তারা আগে তাদেরই জল দিচ্ছিল এবং ইতিমধ্যে ট্রেণও ছেড়ে দিতে লাগলো। বেনেটি এদিকে পয়সা খরচ করে এক লোটা ঠাণ্ডা জল যোগাড় করলো ও তাই দিয়ে আপন তৃষ্ণা দূর করতে করতে ঈষৎ অবজ্ঞাভরে স্বামিজীর দিকে চেয়ে বললো, "ওহে, দেখছো কেমন ঠাণ্ডা জল! তুমি তো সন্ন্যাসী হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করেছ। সঙ্গে একটি পয়সা নেই যে জল কিনে খাও। এখন দেখো মজা! তার চেয়ে যদি আমার মতোন পয়সা রোজগারের চেষ্টা করতে তবে এমন দুর্দশা ভোগ করতে হোত না তোমাকে।"

এইভাবে বাক্যবাণে বিদ্ধ করে চললো লোকটি, অথচ তাঁকে এক ফোঁটা জল দিয়ে সাহায্য করলো না। তার মতে যারা অর্থোপার্জনের জন্য পরিশ্রম না করে সন্ন্যাসী হয় তাদের উপোস করাই উচিত। এই ধারণার বশবর্তী হোয়ে ট্রেণ থেকে নেমেও আগের মতোন স্বামিজীকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো ও নিজে প্লাটফর্মের ছায়ায় বসে রৌদ্র-ক্লিষ্ট স্বামিজীর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো: "দেখো হে, পয়সার ক্ষমতা দেখো—তুমি তো পয়সা কড়ি গ্রাহ্য কর না। তার ফলটাও দেখো। এসব পুরী, কচুরী, পেঁড়া, মিঠাই কি আর বিনা পয়সায় হয়?"—স্বামিজী তখনো তেমনি নির্বিকার—একটি কথাও বললেন না। স্থিরভাবে বসে নিজের চিন্তায় মগ্ন রইলেন।

এরমধ্যে আর একটি লোক, ঐখানেই তার বাড়ি, ডান হাতে একটি পুঁটলি ও লোটা এবং বাঁ হাতে এক কুঁজো জল ও একটি সতরঞ্চি নিয়ে সেইখানে উপস্থিত হোল। ষ্টেশনের চারদিকে বার কতক ঘুরলো সে। কাকে যেন খুঁজছে। অবশেষে স্বামিজীর কাছে এসে বললো, "বাবা, আপনি রৌদ্রে বসে আছেন কেন?

ভেতরে চলুন, আমি আপনার জন্য কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য এনেছি—দয়া করে গ্রহণ করুন।" এই বলে সেই আগন্তুক তাঁকে যত্নের সঙ্গে লুচি ও মিষ্টান্ন ভোজন করিয়ে জল ও হরিতকী খেতে দিলো। তার সঙ্গে হুঁকো-কলকেও ছিল। তাই দিয়ে তামাক সেজে তাঁকে খাওয়ালো। তামাক বিবেকানন্দের বড়ো প্রিয়। হুঁকোয় দু-চারটে টান দিয়ে তাঁর মনটা যখন প্রসন্ন হোল, তখন তিনি কতকটা আশ্চর্য হোয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কে, কোথা থেকে এলে আর কেমন করেই বা আমার কথা জানলে?" লোকটি উত্তর দিলো: "আমি একজন হালুইকর। এখান থেকে একটু দূরে আমার মিঠাইয়ের দোকান আছে। আমি খেয়েদেয়ে ঘুমিয়েছিলাম, এমন সময়ে স্বপ্নে দেখলাম একজন সন্ন্যাসী এসে বলছেন, 'আমার সাধু ষ্টেশনে পড়ে অনাহারে কষ্ট পাচ্ছেন। কাল থেকে তাঁর খাওয়া-দাওয়া হয়নি। তুমি শীঘ্র গিয়ে তাঁর সেবা করো।' আমার ঘুম ভেঙে গেলো। কিন্তু স্বপ্ন কখনো সত্যি হয় না, বিশেষ করে দিনের বেলার স্বপ্ন, এই ভেবে আমি আবার পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু আরো দুবার ঐ রকম স্বপ্ন দেখলাম আর স্বপ্নে ঐ কথা শুনলাম। তখন আর দেরী না করে উঠলাম এবং তৎক্ষণাৎ পুরী তরকারী তৈরী করে সকালের তৈরি মিঠাই, কিছু জল, হরিতকী ও তামাক নিয়ে তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে দৌড়িয়ে এলাম।"

স্বামিজী প্রশ্ন করলেন: "আমিই যে সেই সাধু তা তুমি কি করে জানলে?" লোকটি বললো, "আমারো প্রথমে ঐ সন্দেহ হয়েছিল, সেজন্য এখানে এসে সকলের আগে চারদিক ঘুরে দেখলাম, কিন্তু দ্বিতীয় কোনো সাধুর দর্শন না পাওয়াতে বুঝেছি ঐ সাধু আপনি ছাড়া আর কেউ নন।"

স্বামিজী হালুইকরটিকে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করলেন। শ্লেষপ্রিয়

বেনিয়াটি এতক্ষণ ধরে নীরবে এই আশ্চর্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করছিল। শেষে সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বামিজীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো। তিনি তাকে ক্ষমা করলেন এবং বললেন—"ভগবানের লীলা দেখলে? যে ধর্মপথে চলে তার বোঝা যে তিনিই বহন করেন।" পরবর্তীকালে তিনি যখন তাঁর শিষ্যদের কাছে তাঁর জীবনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতেন, তখন তিনি বলতেন—"এমনি বিশ্বাস রাখবি ভগবানের উপর। তা হোলেই দেখবি তুনিয়াটা তোর পায়ের তলায়।"

এই মহাপুরুষের জীবন ও বাণী আমরা যতই আলোচনা করব ততই আমরা দেখতে পাব যে, এই ভারতবর্ষে একদা রাজা রামমোহন রায় বিরাট সমাজ-সংস্কারের ভেতর দিয়ে মৌলিক চিন্তার যে পথ সুগম করে দিয়েছিলেন, সেই পথের আর এক নূতন পথিক আবির্ভূত হোলেন উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। সেই ভাবময় পুরুষ রামকৃষ্ণদেবের অনুভূতিকে এক বিজাতীয় সভ্যতার আলোকোদ্ভাসিত মধ্যাহ্নবেলায় বিশ্বের সভায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেই এলেন আর এক তেজোময় পুরুষ। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। অপূর্ব বিচারশক্তিসম্পন্ন, অমিত বীর্যশালী ও কর্মময় এই পুরুষসিংহ বিবেকানন্দের জীবন সত্যই আমাদের জাতীয় সম্পদ। এই মহাপুরুষের জীবনকে আমরা তুলনা করতে পারি একটা তেশিরা বা পরকলা কাচের (Prism) সঙ্গে। বর্ণালীর সাহায্যে সূর্যরশ্মির বিচিত্র বর্ণবিন্যাসের কিছু পরিচয় আমরা পাই আমাদের স্থূলচক্ষে। বিজ্ঞানী বলেন এর বাইরেও যে রশ্মি আছে তা ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ধরা দেয় না। এসব অমিত শক্তিধর পুরুষ অতীন্দ্রিয় জগতের বাণী বহন করে নিয়ে আসেন মরজগতে। ভূমার আংশিক পরিচয় এঁদের মধ্যে

দিয়ে পাই, বাকীটা অজানা। জড় দেহে প্রাণসঞ্চার করে, চিন্তার ক্লৈব্য দূর করে হঠাৎ একটা ভাববন্যা সৃষ্টি করে এঁরা বলে যান : 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ বিবোধত'—বলে যান : 'চরৈবেতি'।

কিন্তু এসব প্রতিভাবান পুরুষদের চিন্তাধারা সর্বসাধারণের বোধগম্য নয়। স্বামিজী একজন গতিশীল পুরুষ। তাঁকে বুঝতে হোলে তেমনি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি চাই। বিবেকানন্দ শুধু মানুষ নন, তিনি অতিমানব—এক লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী অতিমানব। সেই শক্তিমান পুরুষ জীবনের স্বল্প পরিধির মধ্যে জাতিকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে গেছেন। জাতির বিবেককে জাগ্রত করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি একজন অসামান্য মানুষ। অসামান্য—অথচ শুকদেবের মতোন সংস্কারমুক্ত। শিশুর মতোন সরল আর বুদ্ধদেবের মতোন হৃদয়বান। তাঁর বাণীর অর্থ তিনি বেঁচে থাকলে আজ কি হোতে পারতো, তা আমাদের জানা নেই। আমাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ, ক্ষমতা সীমিত, চিন্তা অনুদার, কাজেই তাঁর আংশিক রূপ আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য। আরো কত শতবর্ষ পরে নানান জনে নানা কথা বলবে তাঁকে নিয়ে। কিন্তু মূল সত্য থেকে যেন আমাদের বিচ্যুতি না ঘটে। বিবেকানন্দ কি চেয়েছিলেন? তিনি কি ধর্ম প্রচারের ওপর জোর দিয়েছেন, না শিক্ষাবিস্তার, না জনসেবা? অর্থাৎ জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ—এই তিনটার কোনটার ওপর তিনি জোর দিয়েছেন?

তাঁর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা যদি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করি তা'হোলে আমরা বুঝতে পারব যে, স্বামী বিবেকানন্দ এই তিনটি জিনিসের ওপরই সমান জোর দিয়েছেন। এই তিনটিই একাঙ্গীভাবে জড়িত—জ্ঞানের অভাবে ভক্তি অন্ধ, ভক্তির অভাবে জ্ঞান শুষ্ক আর সকল কল্যাণকর্মের প্রেরণা শক্তি ও জ্ঞান এবং ভক্তি। স্বামিজীকে দেখতে পাই কখনো বলছেন ধর্ম

তাইতো আমরা দেখতে পাই যে, এই সন্ন্যাসীর কর্মজীবনের যবনিকা উঠেছে পৃথিবীর অপর প্রান্তে চিকাগো ধর্ম মহাসভায়, যেখানে তিনি ঘোষণা করেছিলেন : "যে ধর্ম জগতকে অন্যের মত সহ্য করতে এবং সকল মতের সর্বজনীনতাকে স্বীকার করতে শিক্ষা দিয়েছে, আমি সেই প্রধান হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে আজ আপনাদের সামনে দাঁড়ালাম।" ধর্মগুরুরূপেই তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, কেননা তিনি তাঁর সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা আর ধ্যান-ধারণা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, মানুষের স্থায়ী উন্নতি করতে গেলে ধর্মের সহজ সরল ব্যাখ্যাই সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। ধর্মের দৃঢ় ভিত্তির ওপরই মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা আর মনুষ্য-সমাজের পুনর্গঠন—এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের কর্মসূচী। তাঁর উত্তরপুরুষের জন্য এই কর্মসূচীই তিনি রেখে গেছেন।

স্বদেশমন্ত্রের সন্ন্যাসী, যুগধর্মের পতাকাবাহী স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশে আজ আমরা বলব : দেশসেবার মহাযজ্ঞে তুমি আত্মাহুতি দিয়েছ। সহানুভূতি আর সেবা—এই তো তোমার জীবনের বাণী। দেশের জন্য এমন তীব্র ও গভীর বেদনাবোধ তোমার মতো আর কে করেছে? তোমাকে প্রণাম করি আর কবির কথায় বলি :

জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী-বীর চীর-গৈরিকধারী।
জয় তরুণ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রত-সহায়কারী॥
নব ভারতে আনিলে তুমি নববেদ,
মুছে দিলে জাতি ধর্মের ভেদ;
জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে উচ্চারি॥